১-২. সাত বছরের বনি

আম্মু, বিনি আমাকে বকেছে। পড়ার টেবিল থেকে রিনরিনে গলায় চাঁচালো সাত বছরের বনি।

ওদের মা তখন ড্রইংরুম গোছাতে ব্যস্ত। বিকেলে কলকাতা থেকে বিনির বাবার বন্ধু আসবেন তাঁর বউ আর দশ বছরের ছেলেকে নিয়ে। ঘরটা গুছিয়ে তাঁকে ছুটতে হবে রান্না ঘরে। বুয়ার হাতে ভালো কোনও রান্না ছেড়ে দেয়ার জো নেই। অঘটন একটা ঘটাবেই সে। ফুলদানিতে ফুল সাজাতে সাজাতে মা বললেন, বিনি বলবে না বনি। বিনি আপু!

পাঁচ বছরের বড় হলেও বিনিকে দায়ে না পড়ে কখনও আপু বলে না বনি। মার কথা শুনে বিনি ওর পড়ার টেবিল থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। ভাবখানা এই–কেমন জব্দ!

বনি আগের মতো চাঁচালো–বিনি আপু আমাকে বকেছে।

মার হাতে গোলাপের কাঁটা ফুটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। জায়গাটা মুখে লাগিয়ে জিভ দিয়ে রক্ত মুছে নিয়ে বললেন, বিনি, বনিকে বকবে না।

এবার বনি গর্বিত ভঙ্গিতে বিনির দিকে তাকালো। বিনির তখন বইয়ের পাতায় গভীর মনোযোগ। বনি পেছন থেকে ওকে জিভ দেখিয়ে দশ পৃষ্ঠা হাতের লেখা লিখতে বসলো। নতুন টিচারকে ও খুব ভয়

পায়। কিছুই বলেন না, শুধু শাস্তির পরিমাণ বাড়ান। হাতের লেখা এক পৃষ্ঠা কম লেখা হলে নরম গলায় বলবেন, আজ বুঝি নয় পৃষ্ঠা লিখেছো! ঠিক আছে কাল দশ পৃষ্ঠা আর দু পৃষ্ঠা আজকের, মোট বারো পৃষ্ঠা লিখবে।

বনি বলে, স্যার দশ পৃষ্ঠা আর এক পৃষ্ঠা হবে। আজ এক পৃষ্ঠা কম লিখেছি।

তুমি ভুলে গেছো বনি। আরো মোলায়েম গলায় স্যার বলেন, তোমাকে বলেছি, কোনও দিন এক পৃষ্ঠা কম লেখা হলে পরদিন সেটা ডবল লিখতে হবে! দু পৃষ্ঠা কম যদি লেখো তাহলে পরদিন চার পৃষ্ঠা বেশি লিখতে হবে। আর যদি দশ পৃষ্ঠাই না লেখো তাহলে বলতো পরদিন মোট কত পৃষ্ঠা লিখতে হবে? এই বলে স্যার হাসি হাসি মুখ করে বনির দিকে তাকান, যেন দারুণ মজার এক অঙ্ক কষতে দিয়েছেন ওকে। বনি শুকনো গলায় বলে, তিরিশ পৃষ্ঠা!

এই তো লক্ষ্মী ছেলে! আমি কিন্তু চাই না তুমি রোজ দশ পৃষ্ঠার বেশি লেখো।

সেই থেকে বনি রোজ দশ পৃষ্ঠা হাতের লেখা লিখছে। বিনি লেখে বিশ পৃষ্ঠা। বিনির বেলায়ও একই নিয়ম। তবে বিনিটা পাজী আছে। বিশ পৃষ্ঠা লিখতে ওর কোনও ভুল হয় না। আর সুযোগ পেলেই স্যারের কাছে বনির নামে নালিশ করে। অবশ্য বিনির নামে নালিশ করার সুযোগ পেলে বনিও সেটা হাতছাড়া করে না। তবে এরকম সুযোগ খুব কমই আসে।

বনি আর বিনি শাহীন স্কুলের ক্লাস ফোর আর সেভেনে পড়ে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লেও স্যারকে প্রথম দিনই বাবা বলে দিয়েছেন–স্কুলে না পড়ালেও বাড়িতে বাংলা যেন ঠিক মতো পড়ানো হয়।

গত বছর মারা যাবার আগে দাদু একটা হুজুর রেখেছেন সপ্তায় তিন দিন আরবি পড়ানোর জন্য। দাদুর কথা মতো হুজুর শুধু কোরাণ শরিফই পড়ান না, আরবি ভাষাও শেখান। দাদু বলে দিয়েছেন, অঙ্কের মতো কোরাণ শরিফ মুখস্ত করলে চলবে না। আরবি ভাষা শিখে অর্থ বুঝে কোরান শরিফ শিখতে হবে।

দশ পৃষ্ঠা বাংলা লেখা যা-ও সহ্য হয়, হুজুর যখন মিহি গলায় আউযুবিল্লাহ হে মিনাশ শায়তানুর রাজিম ..... শুরু করেন বনির বিরক্তির সীমা থাকে না। তারপরও হুজুরকে সহ্য করতে হয়। কারণ বিনি খুব ভক্তির সঙ্গে মাথায় ওড়না দিয়ে হুজুরের কথা মতো সুরার পর সুরা গড় গড় করে মুখস্ত বলে যায়। মাঝে মাঝে বিনির এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতায় বনির বুকটা দুঃখে ভরে যায়। কী ক্ষতি হয় একদিন যদি ও হাতের লেখা দু পৃষ্ঠা কম লেখে, কিংবা হুজুরের ক্লাসে সুরা মুখস্ত করতে ভুলে যায়! পরীক্ষায় প্রত্যেক বার ফাস্ট হতে হবে এ-ও বিনির আরেক শয়তানি। এ না হলে বনিকে বকুনি খাওয়াবে কেমন

করে? পরীক্ষায় কোনও বারই বনি দশের ওপরে উঠতে পারেনি। ওর রিপোর্ট কার্ড দেখার সময় বাবা মা দুজনেরই কপালে ভাঁজ পড়ে, চোখ ছোট হয়ে যায়, অথচ বিনির রিপোর্ট কার্ড দেখার সময় ওঁদের সব কটা দাঁত গোনা যায়। তবে বাবা মা যতই বিরক্ত হোক, বড় চাচী সব সময় ওকে বলেন, বাব্বা, অংকে তুমি আশি পেয়েছো! ইংলিশে নব্বই পেয়েছো। মা তখন অকারণে গায়ে পড়ে চাচীকে বলেন, অংকে আশি পেলে কী হবে, যে ফার্স্ট হয়েছে সে একশ পেয়েছে। ড্রইংয়ে দেখেছেন কত কম নম্বর পেয়েছে?

একমাত্র বড় চাচীই মনে করেন পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার ভেতর বিনির কোনও কৃতিত্ব নেই, আর বনি ইচ্ছে করলেই ফার্স্ট হতে পারে। বড় চাচী মাকে বলেন, বনি অংকে আশি পেয়েছে বলে তোমার মন খারাপ আর খুকুর মাকে দেখো গিয়ে ছেলে পঞ্চাশ পেয়ে পাশ করেছে বলে পাড়ার সবাইকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন।

বিনির আরও অনেক খারাপ স্বভাব আছে, অন্তত বনি তাই মনে করে। কী দরকার রোজ বিকেলে ওর এক গ্লাস দুধ খাওয়ার? নিজে তো খাবে আবার বনি ঠিক মতো খেলো কি না সেটাও ওর দেখতে হবে। ও যদি এসব শয়তানি না করতো তাহলে বনি ঠিকই ওর দুধটুকু বুয়াকে খাইয়ে দিতে পারতো। বেচারা বুয়া কত কষ্ট করে, অথচ এক ফোঁটা দুধ খেতে পায় না। যেদিন বুয়া ওকে বলেছিলো দুধ খায় না বলে ওর গায়ে শক্তি নেই, এত কাজ করতে পারে না, তখন বনি ওর দুধটুকু জোর করে বুয়াকে খাইয়ে দিয়েছে। বলেছে, এখন থেকে আমার দুধ তুমি খাবে। বুয়া অবশ্য প্রথমে রাজী হয়নি। বলেছে, এইডা কী কন ছোড সাব, আম্মায় হুনলে আমারে আস্ত রাখবো নি! বনি অভয় দিয়ে বুয়াকে বলেছে, সব কথা আম্মাকে শোনাতে হবে কেন? আমার দুধ না খেলেও চলবে। আমার গায়ে অনেক শক্তি!

বেশ কিছুদিন দুধ না খেয়ে আরামেই দিন কাটছিলো বনির। বিনির সেটা সহ্য হলো না। একদিন বুয়াকে ওর দুধ খেতে দেখে বিনি মাকে বলেছে, আম্মা, বনি ঠিক মতো দুধ খায় না। ব্যস, তখন থেকেই মা নিয়ম করে দিয়েছেন, বনির দুধ খাওয়ার সময় বিনি সামনে বসে থাকবে। বিনি যে রকম এক চুমুকে পুরো গ্লাসের দুধ খেয়ে ফেলে, বনির সময় লাগে পনেরো কুড়ি মিনিটেরও বেশি। কখনও বেশিও লাগে। কারণ এক ঢোক দুধ গিলে বনি ও প্রত্যেকবার বিনিকে জিভ দেখাতে ভোলে না। ও মনে করে এটা বিনির প্রাপ্য।

আজও যেমন পড়ার টেবিলে বসার আগে আদর করেই বিনিকে ও বলেছিলো, আপু, আম্মুকে বল না আজ আমরা পড়বো না। বিকেলে অমল কাকু আসবে, রিনা কাকী আসবে, আশীষ ভাইয়া আসবে, আর আমরা বুঝি স্যারের কাছে পড়বো! স্যার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজ আবার হুজুরও আসবে!

বিনি ওর কথা কানেই তুললো না। বললো, রোজই তো বাড়িতে মেহমান আসে। আমরা কি রোজ স্যারকে মানা করবো আসতে!

বা রে! রোজ কি কলকাতা থেকে মেহমান আসে? আর কবে বলেছি ভারি যে রোজ রোজ করছিস?

আর কথা নয় বনি! গম্ভীর গলায় বিনি বলেছে, হাতের লেখা শেষ হলে বাকি হোম টাস্ক করে ফেলো।

তখনই বনি চেঁচিয়ে মাকে বলেছে বিনি নাকি ওকে বকেছে। মা-ও সব সময় বিনির পক্ষে। মাঝে মাঝে এক আধটু লোক দেখানো ধমক দিলেও বিনি শাস্তি পাওয়ার মতো বহু কাজ করে, মা দেখেও না দেখার ভান করেন। মা বাবা যখন বিনির পক্ষে কথা বলেন। তখন গোটা পৃথিবীটা অসার মনে হয় বনির। ওর জন্য কারও এতটুকু মায়া দরদ নেই। কথাটা বেশি মনে হয় পড়ার টেবিলে বসলে, আর মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর কান্না পায়। পড়ার টেবিলে বসলে আরও একটা সমস্যা হয় ওর। সেটা হচ্ছে খালি ঘুম পাওয়া। বিছানায় শুলে ঘুম আসতে ঘন্টা পেরিয়ে যায়, অথচ পড়ার টেবিলে পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা হাতের লেখা লিখতে লিখতে ঘুমে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। তারপরও ওর প্রতি বিনির বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।

বিকেলে অমল কাকুরা এলেন হই হই করতে করতে। বনি, বিনি কোথায়, এদিকে এসো। দেখো, তোমাদের জন্য কী এনেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়িটা মাতিয়ে তুললেন তিনি।

এনেছেন তো অনেক কিছুই! বনির জন্য প্যান্ট শার্ট ছাড়াও ম্যাজিক ফ্লাইং বার্ড এনেছেন। চাবি ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে পত পত করে ডানা নাড়তে নাড়তে উড়ে যায়। আরেকটা গাড়ি বানাবার মেকানো সেট। দশ রকম মডেলের গাড়ি বানানোর সব রকম মিনি যন্ত্রপাতি আর স্পেয়ার। বিনির জন্য শুধু ড্রেস আর একটা বিরাট মোটা চিন্দ্রেনস এনসাইক্লোপিডিয়া।

বিনি না বললেও বনি এক ফাঁকে মাকে বলেছিলো, আজ আমরা টিচারের কাছে পড়বো না মা। টিচার এলে চলে যেতে বলবো।

না বনি! মা পষ্ট বলে দিয়েছেন, বিনি পড়বে আর তুমি পড়বে না–এটা হতে পারে না।

সন্ধ্যেবেলা ড্রইং রুমে বসে সবাই জমিয়ে গল্প করছিলো। রিনা কাকী বলছিলেন, গত সামারে ওয়েলস-এ যখন তারা হলিডে করতে গিয়েছিলেন তখন কত সব মজার ঘটনা ঘটেছে। বনির এটাও

এক দুঃখ। গরম হোক আর শীত হোক কোনও ছুটিতেই বাবা মা ওদের বাইরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান না। সেই ক্লাস ওয়ানে থাকতে একবার কক্সবাজার গিয়েছিলো, তা-ও অলক কাকু জোর করে ধরাতে। তিনি বিরাট বাংলো পেয়েছেন, পাজেরো গাড়ি আছে, থাকার কোনও অসুবিধে হবে না, এসব বলে-টলে রাজী করানো গিয়েছিলো বাবাকে। তারপর কত সামার গেলো, কত উইন্টার গেলো, রোজার বন্ধ, পূজোর ছুটি–কখনও কোথাও যাওয়া হলো না। আশীষ ভাইয়ার দিকে একবার তাকালো বনি । ও তখন নিবিষ্ট মনে ইলেক্ট্রনিক গেম খেলছিলো। বনির দারুণ হিংসা হলো আশীষের ওপর। প্রত্যেক সামারে ওরা ইউরোপের কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়। রাগ হলো বিনির ওপর। এ নিয়ে বিনি কোনও দিন বাবা মাকে একটা কথাও বলেনি।

ঠিক সাড়ে ছটায় ডোর বেল বাজলো। বিনি উঠে গেলো দরজা খুলতে। টিচার এসেছেন। কোনও দিন এক মিনিটও দেরি করেন না। বনিও শুকনো মুখে উঠে দাঁড়ালো। রিনা কাকীর গল্পের আসল মজার জায়গাটাই শোনা হলো না। দারুণ সস্তায় পেয়ে ওঁরা যে পুরোনো দুর্গের মতো মোটেলে উঠেছেন ওটা আসলে একটা হন্টেড প্যালেস–এটুকু শুনেই বনিকে উঠে যেতে হলো।

রিনা কাকী গল্প বলা থামিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলেন, বিনি বনি কোথায় গেলো?

মা বললেন, ওদের টিচার এসেছেন।

আজ আবার কিসের টিচার বিথি? আমরা দুদিনের জন্য এলাম, সবাই মিলে মজা করবো, আর তুমি বাচ্চা দুটোকে পাঠালে টিচারের কাছে? এটা তোমার ভারি অন্যায় বিথি। তুমি জানো না ওরা তোমাকে কী রকম দয়ামায়াহীন পাষাণ ভাবছে। আমাকে বলতেই হবে বিথি, এটাও এক প্রকার নিষ্ঠুরতা। রিনা কাকী বাংলায় এম এ পড়েছিলেন । এখনও নাকি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতে বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। নিজেও কথা বলার সময় কঠিন কঠিন শব্দ বলেন।

বাবা মৃদু হেসে বললেন, ঠিক আছে বিথি, টিচারকে বলো ওরা আজ পড়বে না।

শুধু আজ নয়, কাল এবং পরশুও। ঘোষণা করলেন রিনা কাকী–কাল আমরা আনন্দ মেলায় যাবো।

বনি তখনও পড়ার ঘরে যায়নি। ড্রইং রুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলো। রিনা কাকীর কথা শুনে মনে হলো আকাশ থেকে বুঝি কোনও পরি নেমে এসেছে ওদের বাসায়।

পরদিন অমল কাকু সবাইকে নিয়ে শেরে বাংলা নগরে গেলেন আনন্দমেলা দেখতে। আশীষ কখনও বাংলাদেশের মেলা দেখেনি। বাবা যখন বললেন মেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে পুতুল নাচের দল এসেছে, ফরিদপুরের যাত্রার দল নিউ ভাণ্ডারি অপেরা এসেছে, খুলনার জেমিনি সার্কাস এসেছে অমল

কাকু আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বললেন, কত বছর হলো যাত্রা দেখিনি! কোন যাত্রা হবে, রূপবান না গুনাই বিবি?

বাবা হেসে বললেন, আজকাল শহরের লোকেরা গুনাই বিবি দেখে না। এরা দেখাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

ঠিক আছে মাহমুদ, অমল কাকু বললেন, আজ সবাই মিলে মেলা দেখা যাক। কাল তুই আর আমি সারা রাত যাত্রা দেখবো।

আশীষ অবাক হয়ে বললো, সারা রাত দেখবে? কয়টা শো হবে এক রাতে?

কয়টা নারে বেটা, একটাই। আমাদের দেশে যাত্রার একটা শশা সারা রাত ধরে হয়। চৌষট্টি সালে দাঙ্গার পর অমল কাকুরা ইণ্ডিয়া চলে গেছেন। তারপরও দেশ মনে করেন বাংলাদেশকে।

বাবা বললেন, আজ কাল সারা রাত হয় না। চার পাঁচ ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

হোক শেষ! তবু দেখবো। যাত্রা বলে কথা!

ঢাকায় প্রায় প্রতি বছরই এরকম আনন্দমেলা হয়। বনির দুর্ভাগ্য কোনো দিন এখানে আসার সুযোগ হয়নি। মেলায় নাকি প্রচণ্ড ধুলো, প্রচণ্ড ভিড়। ছেলেধরা আর পকেটমারের দল নাকি ওঁৎ পেতে বসে আছে সব খানে আরও কত সব কথা। বিনিকে বলেও লাভ হয়নি, ও বলেছে, বাবার কত কাজ! মেলায় যাওয়ার সময় কোথায়?

মেলায় এসে অমল কাকু একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন। পুতুল নাচ দেখতে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বাবাকে উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, কনটেন্টটা মডার্ন হলেও ট্র্যাডিশনাল ফর্মটা এখনও ধরে রেখেছে।

পুতুল নাচ দেখে বনিও কম মজা পেলো না। শুধু আশীষ বললো, কলকাতায় এর চেয়ে অনেক গর্জিয়াস পাপেট শো হয়।

আশীষের কথা বনির ভালো লাগলো না। বিনিকে চুপি চুপি বললো, বিনি আপু, তোর ভালো লাগেনি পুতুল নাচ?

বিনিও স্বীকার করলো যে পুতুল নাচটা দারুণ হয়েছে। অমল কাকু বললেন, এমন জিনিস পৃথিবীর কোথাও পাবে না।

পুতুল নাচের পর মৃত্যু কূপের খেলা দেখে, ফুচকা খেয়ে যখন ওরা সার্কাসের তাঁবুর পাশে দাঁড়ালো তখন হঠাৎ বিনি শক্ত করে বনির হাত চেপে ধরলো। ভয় পাওয়া গলায় ফিশ ফিশ করে বললো, বনি, মা বাবারা সব কোথায়?

বিনির কথা ঠিক মতো শুনতে পায়নি বনি। বললো, কী হয়েছে বিনি আপু? এমন করছিস কেন?

বিনি বললো, বাবা, অমল কাকু, মা, রিনা কাকী–সবাই কোথায়?

বনি বললো, অমল কাকু আর বাবা তো সার্কাসের টিকেট কাটতে গেলেন।

মা, রিনা কাকী আর আশীষ? ওরা কোথায়?

নিশ্চয় এখনও ফুচকা খাচ্ছে।

তুই এখানে দাঁড়া বনি। আমি ফুচকার দোকানটা দেখে আসি।

হঠাৎ বনির বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আপু, আমি তোর সঙ্গে থাকবো।

ঠিক আছে, বোকা ছেলে! কাঁদছিস কেন? চল, আমরা দুজনে মিলে ওদের খুঁজে বের করি।

বনির হাত ধরে বিনি ফুচকার দোকানে এসে দেখলো মা, রিনা কাকীরা সেখানে নেই। চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। মানুষের ভিড়ে কিছুই দেখতে পেলো না।

মানুষের এত ভিড়, পেছন থেকে শুধু ধাক্কা দিচ্ছে সামনে যাওয়ার জন্য। লোকজনের ধাক্কা খেতে খেতে বিনি আর বনি নাগরদোলার কাছে এসে গেলো । বিনি পাগলের মতো মাথা উঁচু করে ওর মা বাবাদের খুঁজলো। চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ–মা বাবা কোথাও নেই।

এতক্ষণে বিনি নিশ্চিত হলো–ওরা মা বাবাকে হারিয়ে ফেলেছে। তবু ও ভয় পেলো না। বনি কিছুতেই কান্না সামলাতে পারছিলো না। বিনি বললো, বনি ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা কোনো পুলিসকে বলবো আমাদের বাবা মাকে খুঁজে পাচ্ছি না। বাসার ঠিকানা বললে ওরা ঠিকই পৌঁছে দেবে।

আমাদের যদি এখন ছেলেধরা এসে ধরে নিয়ে যায়!

পাগল হয়েছিস! এত লোক এখানে! কোনো ছেলেধরার সাহস হবে না এখানে আসতে।

.

০২.

ফুচকার দোকান থেকে সার্কাসের তাঁবুর দিকে আসতেই মা হঠাৎ খেয়াল করলেন, বিনি আর বনি ওঁদের সঙ্গে নেই । বিনি সারাক্ষণ ওঁকে ধরে রেখেছিলো। ফুচকার দোকানে ঢোকার আগেও বিনিকে

তিনি বলেছিলেন, কক্ষণো যেন তাঁর হাত না ছাড়ে। ভয় পাওয়া গলায় তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন–মাহমুদ, বনি বিনি কোথায়?

মার গলা শুনে বাবা চমকে উঠলেন–কেন, তোমার সঙ্গেই তো ছিলো ওরা?

অমল কাকু আর বাবার দুহাত বোঝাই মাটির সব পুতুল, ঘোড়া, হাতি আর ছোট ছোট নকশা করা ফুলের টবে ।

ছিলো তো আমার সঙ্গে। মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, এখন তো দেখছি না!

তোমরা সবাই এখানে দাঁড়াও। বলে হাতের জিনিসগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে বাবা বললেন, আমি দেখছি। নিশ্চয়ই আশে পাশে কোথাও আছে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে বাবা গলা তুলে ডাকলেন বনি, বিনি! তোমরা কোথায়? বনি, বিনি .....

চিৎকার করে বনি বিনিকে ডেকে চারপাশে খুঁজতে খুঁজতে বাবার গলা বসে গেলো, রক্তের চাপ বেড়ে গেলো, বুকের ভেতর ধড়ফড় করতে লাগলো কোথাও ওদের দেখা গেলো না। ফিরে এসে ভাঙা গলায় বললেন, না, আশে পাশে কোথাও ওরা নেই।

মা ফুঁপিয়ে উঠলেন, এখন কী হবে, বলে।

একজন বুড়ো দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বাবা মার দিশেহারা অবস্থা দেখে বললেন, আপনাদের কি ছেলে মেয়ে হারিয়েছে?

ব্যগ্র হয়ে বাবা বললেন, হ্যাঁ, আমাদের বনি বিনি! কোথায় ওরা?

মেইন গেট এর পাশে তথ্য কেন্দ্র আছে। ওখানে আমি দেখেছি হারিয়ে যাওয়া দুটো ছেলে মেয়ে বসে কাঁদছে।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বলে বাবা ছুটলেন তথ্য কেন্দ্রের দিকে। তার পেছন পেছন অন্যরাও ছুটলো। ছুটতে গিয়ে কারও সঙ্গে ধাক্কা লাগলো, কারও হাতের জিনিস পড়ে গেলো। ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন মোটাসোটা এক বয়স্ক মহিলা। চিলের মতো চিৎকার করে উঠলেন তিনি–আঁ এ কি! চোখের মাথা খেয়েছে নাকি– তাঁর কথা শোনার সময় বনি বিনির বাবা-মাদের ছিলো না।

হাঁপাতে হাঁপাতে তথ্য কেন্দ্রে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বনি বিনির মা। তথ্য কেন্দ্রে দুটো ছেলে মেয়ে বসে আছে ঠিকই, ওরা বনি বিনি নয়। ছেলেটার বয়স ছয়, মেয়েটার চার। মাইকে ওদের নাম বলে ওদের বাবা মাকে ডাকা হচ্ছে।

অমল কাকু বললেন, বনি বিনির নামও তো এভাবে অ্যানাউন্স করা যেতে পারে। আমি দেখছি।

তিনি ভেতরে গিয়ে একটা কাগজে লিখে দিলেন কী বলতে হবে। পাঁচ মিনিট পর তথ্য কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তারা শুনলেন, মাইকে বলা হচ্ছে বনি আর বিনি নামের দুটো ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেছে। বনির বয়স নয়, বিনির বয়স বারো। ওদের পরনে নীল সাদা প্যান্ট শার্ট আর লাল সাদা ফ্রক। কেউ ওদের পেলে দয়া করে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছে দেবেন। বনি, বিনি, তোমরা যেখানে আছো তথ্য কেন্দ্রে চলে এসো! তোমাদের বাবা মা এখানে অপেক্ষা করছেন।

পর পর কয়েকবার ঘোষণাটা মাইকে প্রচার করা হলো। মিনিট দশেক পরে এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা সাত বছরের মেয়ের হাত ধরে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন। এই মেয়েটিও হারিয়ে গেছে। তথ্য কেন্দ্র থেকে বলা হলো–টুম্পা নামের সাত বছরের একটি মেয়ে পাওয়া গেছে। ওর বাবা মাকে বলা হচ্ছে এখনই তথ্য কেন্দ্রে আসা জন্য।

তথ্য কেন্দ্রের সিঁড়ির ওপর বসে মা দুহাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন ওঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রিনা কাকীও কাঁদলেন। তারপরও বললেন, মন শক্ত করে বিথি। বনি বিনির কিছুই হয়নি। ওরা এক্ষুণি আসবে।

তথ্য কেন্দ্রের একজন তরুণ কর্মী বেরিয়ে এসে বললো, গেট-এর বাইরে পুলি ক্যাম্প আছে। আপনারা কেউ গিয়ে ওদের অনুরোধ করুন মেলার গেট-এ যেন পুলি: পাহারা বসায়। বাচ্চারা যেন মেলা থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে।

অমল কাকু বাবাকে বললেন, তোরা এখানে থাক। আমি পুলিস ক্ল্যাম্পে গি খবরটা দিয়ে আসি।

বাবা মাথা নেড়ে শুধু সায় জানালেন। কী করবেন, কোথায় যাবেন কিছুই তাঁর মাথা ঢুকছে না। একটু পরে মাকে বললেন, তোমরা এখানে থাকো। মেলার পুরো এলাকাট আমি একবার ঘুরে দেখে আসি।

রিনা কাকী বললেন, তাই যান। অমল এলে আমি ওকেও বলবো এ পাশটায় খুঁজতে

বাবা ভাঙা গলায় বনি, বিনি, ডাকতে ডাকতে ভিড়ের ভেতর মিশে গেলেন। তখনও অঝোরে কেঁদে চলেছেন। আশীষ কী করবে বুঝতে না পেরে গম্ভীর হয়ে সিঁড়ি ওপর বসেছিলো।

মেলার আরেক প্রান্তে বিনি তখন কিছুতেই বনির কান্না থামাতে পারছিলো না। বার বা বলছিলো, ছিঃ ভাইয়া, কাঁদে না। সবাই তোমাকে ছিঃ বলবে। বাবা মা এক্ষুণি এতে যাবেন। কিছুতেই বনির কান্না থামানো যাচ্ছিলো না। ঠিক সেই সময় দাড়িওয়ালা আচকা পরা এক লোক মোলায়েম গলায় এসে ওদের প্রশ্ন করলো–তোমরা বিনি আর বনি না?

বিনি ব্যস্ত গলায় বললো, হ্যাঁ, কেন?

তোমাদের বাবা মা তথ্য কেন্দ্রে বসে আছেন। মাইকে তোমাদের নাম ধরে ডাব হচ্ছে, শোন নি?

চারপাশে যে হারে মাইকে হিন্দি সিনেমার গান বাজছিলো–তথ্য কেন্দ্রের মাইকে শব্দ এদিকে শোনা যাচ্ছিলো না। বনি কান্না থামিয়ে উদ্গ্রীব হয়ে জানতে চাইলে কোথায় তথ্য কেন্দ্র?

আমার সঙ্গে এসো। বলে হাত বাড়িয়ে দিলো দাড়িওয়ালা লোকটা।

বনি লোকটার হাত চেপে ধরলো। বিনি শক্ত ভাবে ধরে রাখলো বনির আরেক হাত ভিড় ঠেলে বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর বনি প্রশ্ন করলো, তথ্য কেন্দ্র আর কত দূরে?

এই তো এসে গেছি। বলে আরও কিছুটা পথ এগিয়ে গেলো ওরা। এদিকটা ভিড় কম। বাইরে শেরে বাংলা নগরের ফাঁকা রাস্তা। লোকটা আবার বললো, এই গেট পার হলেই তথ্য কেন্দ্র।

বিনির কেমন যেন মনে হচ্ছিলো। যতক্ষণ ভিড়ের ভেতর ছিলো ততক্ষণ ওর ভ কম ছিলো। ফাঁকা জায়গায় এসে ভয় বেড়ে গেলো। বললো, আপনি ঠিক চেনেন তে . তথ্য কেন্দ্র কোথায়?

কেন চিনবো না? লোকটা নরম গলায় বললো, আমি নিজেই তো তথ্য কেন্দ্রে কাজ করি। তোমাদের খোঁজার জন্য আমাদের লোকজন সব বেরিয়ে পড়েছে।

লোকটা বনির হাত ধরে গেট-এর বাইরে এসে দাঁড়াতেই একটা সাদা মাইক্রোবাস ধাঁ করে ওদের পাশে থামলো। ঝট করে দরজা খুলে গেলো। বিকট দর্শন দুটো লোক ভেতর থেকে নেমে এসে বনি আর বিনির পেছনে দাঁড়িয়ে পিঠে ছুরি ঠেকালো–একদম চুপ! কথা কইলে দুই টুকরা কইরা ফালামু!

দাড়িওয়ালা লোকটা ওদের কোলে করে গাড়িতে তুলে দিলো। গুন্ডা দুটো ওদের পেছন পেছন গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করলো। ভয়ে বনি বিনির গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। গাড়ি যখন স্পিড় নিয়েছে তখনই পেছন থেকে কে যেন বনি বিনির নাকে ভেজা রুমাল চেপে ধরলো। একটু পরেই ওরা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো গাড়ির সিটের ওপর। দাড়িওয়ালা খিক খিক করে হেসে গুন্ডা দুটোকে বললো, মাহমুদ হারামিটা এবার টের পাবে হুজুরের বিরুদ্ধে কথা বলার মজাটা।

সাদা মাইক্রোবাসটা তখন বনি বিনিকে নিয়ে ঘন্টায় সত্তর মাইল স্পিডে ছুটে চলেছে জয়দেবপুরের দিকে।

দাড়িওয়ালা যে লোকটা বনি বিনিকে মিথ্যে কথা বলে গুন্ডাদের হাতে তুলে দিয়েছে ওর নাম আবদুল মালেক। একাত্তর সালে সে ছিলো আলবদরের খুনী। ওদের কাজ ছিলো মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে দেশের বড় বড় লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আর সব জ্ঞানী গুণী মানুষদের বাড়ি থেকে ধরে এনে মেরে ফেলা। আবদুল মালেক নিজের হাতে পনেরো জন নামকরা

মানুষকে খুন করেছে। যুদ্ধের পর কয়েক বছর পালিয়েছিলো গ্রামের বাড়িতে। তারপর যেই শুনলো বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলা হয়েছে, নতুন প্রেসিডেন্ট এসে বলেছেন ওরা দল করতে পারবে তখন আবদুল মালেক ঢাকা চলে এসেছে।

ওদের দলে তখন নতুন নতুন লোক নিচ্ছিলো। পুরোনো যারা একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের খুন করেছিলো দলের ভেতর তাদের বড় বড় পদ দেয়া হলো। মোটা বেতন, বাড়ি গাড়ি সব দেয়া হলো। ওরা নতুনদের তৈরি করতে লাগলো–যারা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলবে তাদের কীভাবে জবাই করবে, কীভাবে হাত আর পায়ের রগ কাটবে, যাতে কোনো দিন চলাফেরার ক্ষমতা না থাকে। সৌদি আরব থেকে ওদের দলের জন্য কোটি কোটি টাকা পাঠানো হয়। আরব দেশগুলোর সঙ্গে অনেক রকম ব্যবসা আছে ওদের। এসব টাকায় দামী দামী অস্ত্র কিনে, নতুন ছেলেদের ট্রেনিং দিয়ে চট্টগ্রাম আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরীহ ছাত্রদের জবাই করে ভালোই দিন কাটাচ্ছিলো ওরা। মাঝখান থেকে এক ঝামেলা শুরু করেছে কোনো এক শহীদের মা!

জাহানারা ইমাম যখন নির্মূল কমিটি গঠন করে বললেন, একাত্তরের খুনীদের বিচার করতে হবে, তখনই দেশ সুদ্দো মানুষ তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। আবদুল মালেক আর ওর দলের নেতারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। ওরা সবাই একাত্তরে হাজার হাজার খুন করেছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তিযুদ্ধের সময় যে তিরিশ লাখ মানুষকে মেরেছিলো, তাদের চিনিয়ে দিয়েছিলো আবদুল মালেকের দলের লোকেরাই। এখন যদি বিচার শুরু হয় ওদের কেউ রেহাই পাবে না। তাই ওরা ঠিক করেছে জাহানারা ইমামের সঙ্গে যারা থাকবে তাদের শায়েস্তা করতে হবে। ওদের লোক পুলিসের ভেতর রয়েছে, আর্মির ভেতরও রয়েছে। বড় বড় সরকারী চাকুরেও ওদের কম নয়। জাহানারা ইমামের সঙ্গে যারা আছে তাদের যেভাবে পারছে সেভাবেই শায়েস্তা করছে আবদুল মালেকের দল।

বনি বিনির বাবা মাহমুদ হোসেন একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। জাহানারা ইমামের যে ছেলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন সেই রুমীর সঙ্গে দু নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। এখন ব্যবসা করেন। জাহানারা ইমাম তাঁকে বলেছেন নির্মূল কমিটিতে কাজ করার জন্য। দু বছর ধরে তিনি তাই করছেন। তাঁকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায় এ নিয়ে আবদুল মালেকের দল অনেকে ভেবেছে। ওদের নেতা বলে দিয়েছে, যার দুর্বলতা যেখানে, তাকে সেখানে আঘাত করতে।

অনেক খোঁজ খবর নিয়ে আবদুল মালেকরা জানতে পেরেছে মাহমুদ হোসেনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে তার ছেলেমেয়ে দুটো। তাই ওরা ঠিক করেছে এ দুটোকে চুরি করে সৌদি আরবে পাচার করে

দেবে। আজকাল সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খুব চাহিদা। আরব শেখরা এক ধরনের উটের দৌড় উপভোগ করে। উটের দৌড়ের জন্য ওদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দরকার। অনেক দাম দিয়ে শেখদের দালালরা গরিব দেশগুলো থেকে মানুষের বাচ্চা কেনে। বনির মতো ফুটফুট ছেলে দেখলে লুফে নেবে উটের দৌড়ের দালালরা। বিনিকে অন্য কাজে লাগাবে।

বনি বিনিকে চুরি করার জন্য অনেক দিন ধরে তক্কে তক্কে ছিলে আবদুল মালেক। বনির বাবা মা ধারণাও করতে পারবেন না কিছুদিন ধরে যে নুলো ফকিরটা ওঁদের বাড়ির উল্টো দিকের রাস্তায় বসে ভিক্ষে করে সে আসলে মালেকদের দলের লোক। গত মাসে বনিদের গাড়ির পুরানো ড্রাইভারকে অনেক বেশি বেতন দিয়ে নিয়ে গেছে মালেকদের দলের এক নেতা। নতুন যে ড্রাইভারটা এসেছে সেও ওদের দলের লোক। এখন ওরা রান্নার বাবুর্চিকে বাগাবার তালে আছে। বনির বাবাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে বলে বুড়োকে এখনও পটানো যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে টাকার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে। নিজের পরিকল্পনায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে হা হা করে হাসলো আবদুল মালেক।

৩-৪. জ্ঞান ফিরলো বনি আর বিনির

অনেক রাতে জ্ঞান ফিরলো বনি আর বিনির। ওরা তখন একটা চলন্ত মাল টানা রেলগাড়ির কামরায়। মালগাড়ির শক্ত মেঝের ওপর অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থেকে আর চলন্ত রেলের ঝাঁকুনিতে ওদের হাত পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিলো। বিনির জ্ঞান ফেরার পর প্রথমে বোঝার চেষ্টা করলো ও কোথায়। বনিকে এক কোণে পড়ে থাকতে দেখে ওর কাছে ছুটে যেতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলো।

গুন্ডা দুটো এক পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভেতর কী যেন বলাবলি করছিলো। একটা টেকো আরেকটা বেদম কালো। বিনিকে পড়ে যেতে দেখে ওরা খ্যাক খ্যাক করে হাসলো। বিনি ভয় পেয়ে বনির কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো।

বনি চোখ মেলে যেই দেখলো অচেনা এক অদ্ভুত জায়গায় ও পড়ে আছে–হাউ মাউ করে কান্না জুড়ে দিলো। টেকো গুন্ডাটা বাজখাই গলায় বললো, অই চিল্লাবি না কইলাম।

বিনির ভয় হলো, বনি কান্নাকাটি করলে সত্যি সত্যি হয়তো ওকে মেরে ফেলবে। বনিকে বুকে টেনে আদর করে বললো, কাঁদে না বনি ভাইয়া। চুপ কর।

বনি কান্না জড়ানো গলায় বললো, আমি আম্মু আম্মুর কাছে যাবো।

খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে টেকো গুন্ডা বললো, নিজের বাপ মায়রে ভুইলা যাও। তোমগোরে নতুন বাপ মার কাছে লয়া যাইতাছি।

কালো গুন্ডা ওর সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলো, চাটগাঁ গিয়া মাল ডেলিবারির সময় কুননা ঝামেলা ওইব না তো!

ইস্টিশনে অগো মানুষ থাকবো। কুনো ঝামেলার কারবারে আমি নাই। এই বলে ও বনি বিনির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। বিনিকে বললো, অই ছেমরি হোন। ইস্টিশনে নাইমা যদি চিল্লাচিল্লি করছস তর ভাইরে কাইট্যা দুই টুকরা কইরা ফালামু।

বিনি এবার কান্না সামলাতে পারলো না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, আমি কিছু করবো না। আমার ভাইকে তোমরা মেরো না।

রাত বারোটা পর্যন্ত বনি বিনির বাবা মা আর অমল কাকু, রিনা কাকীরা সারা মেলা চষে ফেলেছিলেন। মেলার সব কটা গেট-এ পুলিস মোতায়েন করা হয়েছিলো। ততক্ষণে আবদুল মালেক বনি বিনিদের মেলা থেকে বের করে নিয়ে গেছে অনেক দূর।

রাত দশটার পর থেকেই দোকানগুলো এক এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। এগারোটা নাগাদ সব দোকান বন্ধ হয়ে গেলো। তারপরও বনির মা বাবা বসেছিলেন যাত্রা শেষ হওয়ার জন্য। যদি ওরা যাত্রায় ঢুকে পড়ে কারো সঙ্গে! পুলিশ অবশ্য যাত্রা শুরু হওয়ার পর পরই তাঁবুর ভেতর থেকে ঘুরে এসেছে, তবু মা বাবার মন মানছিলো না। যাত্রা শেষ হওয়ার পর রাত সাড়ে বারোটায় ওঁরা ঘরে ফিরলেন। বাড়িতে ঢোকার পর বুড়ো বাবুর্চি গণি মিয়া আর বুয়া যখন শুনলো বনি বিনি মেলা থেকে হারিয়ে গেছে তখন আরেক দফা কান্নার রোল উঠলো।

পুলিসের এক ডিআইজি ছিলেন বনির বাবার বন্ধু। আনন্দ মেলার পুলিস ক্যাম্প থেকে তাকে ফোন করে পাননি। নাকি শহরের বাইরে আছেন, ফিরতে অনেক রাত হবে। ঘরে ঢুকে মা থমথমে গলায় বললেন, সেলিম ভাইকে একবার ফোন করো।

কোনো কথা না বলে ডিআইজি সেলিম তরফদারকে ফোন করলেন বনির বাবা। ডিআইজিকে বাড়িতেই পেলেন। সম্ভবত কাজের লোক ফোন ধরেছিলো। বড় অফিসারদের বাড়িতে যারা কাজ করে তাদেরও মেজাজ একটু চড়া থাকে। বললো, এত রাতে স্যারকে ফোন দেয়া যাবে না।

বাবা ওকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমাকে যা বলছি তাই করো। এক্ষুণি সেলিমকে ফোন দাও। বলল মাহমুদ হোসেন কথা বলবে।

ধমক খেয়ে লোকটা দোতালায় ডিআইজির রুমে কানেকশন লাগিয়ে বললো, স্যার, মাহমুদ হোসেন সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

সেলিম তরফদারও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। স্কুলে বনির বাবার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন, সেই থেকে তাদের বন্ধুত্ব। এত রাতে পুরোনো বন্ধুর ফোন পেয়ে তিনি চিন্তিত হলেন। আর্দালিকে বললেন লাইন দেয়ার জন্য।

বনির বাবার কথা শুনে তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। বললেন, যা করার আমি করছি। তোরা এভাবে ভেঙে পড়িস না। এখন ঘুমোতে যা, কাল সকালে আমি তোদের। বাসায় আসছি।

ডিআইজি সেলিম তরফদার পুলিসের এসপি আর ডেপুটি কমিশনার–দুজনকে টেলিফোন করে ঘটনাটা জানিয়ে বললেন, তাঁর খুবই আপন জন এরা। যেভাবে হোক বাচ্চা দুটোকে উদ্ধার করতেই হবে। তিনি নিশ্চিত যে এটা অপহরণের ঘটনা এবং দু এক দিনের মধ্যেই মোটা অঙ্কের টাকা চেয়ে পাঠাবে অপহরণকারীরা।

সকাল নটায় তিনি অফিস হয়ে তাঁর বন্ধুর বাসায় গেলেন। বনির বাবা মা দুজনই উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওদের কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে?

গম্ভীর হয়ে পুলিসের ডিআইজি বললেন, না, এখনো কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

হতাশ হয়ে বাবা বললেন, আয়, বোস একটু। তোর কি মনে হয় ওরা কোনো ছেলেধরা গ্যাঙের পাল্লায় পড়েছে?

সন্দেহজনক সব জায়গাইতেই খোঁজা হচ্ছে।

মা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, ছেলে ধরাদের হাতে পড়লে কম বয়সী ছেলেমেয়েদের ওরা হাত পা ভেঙে ভিক্ষে করতে বসায়।

সেলিম তরফদার বললেন, বড়লোকের ছেলেমেয়েদের দিয়ে ওরা ভিক্ষে করায় না। মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের জন্য ওরা কিডন্যাপ করে।

বনির বাবা দু হাতে তার বন্ধুর হাত চেপে ধরে বললেন, যত টাকা লাগে আমি দেবো সেলিম, তুই শুধু আমার বিনি বনিকে ফিরিয়ে এনে দে।

আমার ধারণা আজ যে কোনো সময়ে ওরা ফোন করে টাকা চাইতে পারে।

অমল কাকু চুপচাপ বসে বনির বাবার সঙ্গে ডিআইজির কথা শুনছিলেন। বললেন, কিডন্যাপাররা যদি টাকা চায় তো ভালো। এমনও তো হতে পারে ওদের দেশের বাইরে পাচার করে দিয়েছে?

হতে পারে। ডিআইজি বললেন, বর্ডারের সব চেক পোস্টে আর থানায় কাল রাতেই খবর পাঠানো হয়েছে। হাইওয়েতে গাড়ি চেক করা হচ্ছে।

অমল কাকু চিন্তিত গলায় বললেন, এটা তো রুটিন কাজ। কিডন্যাপাররাও জানে পুলিস এরকম স্টেপ নেবে। ওরা স্বাভাবিকভাবেই অন্য কোনও পথ খুঁজতে চাইবে।

ওরা যদি চেক পোস্টের বাইরে দিয়ে বর্ডার পার হতে চায় সেক্ষেত্রে আটকানো কঠিন কাজ হবে।

রিনা কাকী বললেন, আমার মনে হয় অবিলম্বে টেলিভিশন আর সংবাদপত্রে হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের জনসাধারণ এতে সতর্ক হতে পারে। অপহরণকারীদের প্রকাশ্যে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

বাবা তার ডিআইজি বন্ধুর কাছে জানতে চাইলেন হারানো বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে যদি আমি পুরষ্কার ঘোষণা করি তাহলে কেমন হয়?

মা ব্যগ্র হয়ে বললেন, দশ লাখ টাকা ঘোষণা করে দাও। এতেও যদি আমার চোখের মনিদের ফেরত পাই।

ডিআইজি সেলিম একটু বিব্রত হয়ে বললেন, হারানো বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা যেতে পারে। তবে টাকার অঙ্কটা কম হওয়া উচিৎ।

কেন, কম কেন? তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলেন মা।

ওরা যদি সত্যি সত্যি কোনও খারাপ দলের হাতে পড়ে, বেশি অঙ্কের টাকা দেখলে ওদের নিজেদের ভেতর ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে মারপিট হতে পারে। কিংবা ওদের শত্রু পক্ষ গুন্ডাদের খপ্পর থেকে কেড়ে নিতে চাইতে পারে। যাই হোক এতে বনি বিনির জীবন বিপন্ন হতে পারে।

তাহলে? ভাঙা গলায় মা জানতে চাইলেন, আপনি কত টাকা ঘোষণা করতে বলেন?

আপাতত পঞ্চাশ হাজারের কথা বলুন। পরে না হয় টাকার অঙ্ক বাড়ানো যাবে। ঠিক আছে তাই করুন। হতাশ হয়ে বললেন মা।

ডিআইজি তার পকেট থেকে টেলিফোন বের করে ডেপুটি কমিশনারকে হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচারের কথা বলে দিলেন।

মিনিট পনেরোর ভেতর ডেপুটি কমিশনারের অফিসের লোক এসে বনি বিনির ছবি নিয়ে গেলো। আধ ঘন্টা পর ডেপুটি কমিশনার জানালেন, রেডিওতে দুপুর থেকে যাবে আর টেলিভিশনে সন্ধ্যা থেকে। বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে আটটা দৈনিক পত্রিকায় আগামী কাল ছবি সহ হারানো বিজ্ঞপ্তি যাবে।

ডিআইজি সেলিম বললেন, আমি এখন উঠি। ঠিক তখনই টেলিফোন বাজলো। দুবার রিং হতেই বাবা টেলিফোন ধরে হ্যালো বললেন। একটু পরেই তিনি রিসিভারে

হ্যাঁ, বলে সেলিম তরফদারকে ইশারা করলেন প্যারালাল লাইনে কথা শোনার জন্য।

ওপাশ থেকে একটা ফ্যাশফ্যাশে গলা শুনলেন বাবা কী ওইলো কতা কন না ক্যা? আপনের পোলা মাইয়া হারানি গ্যাছে না?

হ্যাঁ।

হ্যাগো নাম বনি আর বিনি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরা কোথায়?

আমাগো হেপাজতে আছে, ভালাই আছে। হ্যাঁগরে পাইতে ওইলে কিছু মাল পানি ছাড়ন লাগবো?

কত টাকা চান আপনারা?

বেসি না, দশ লাখ।

আমি দেবো। আমাকে বনি বিনির সঙ্গে কথা বলতে দিন।

এত জলদী কিসের? জলদীর কাম সয়তানে করে। ট্যাকা রেডি রাইখেন। আমি রাইতে কতা কমু। এই বলে ওপাশ থেকে লাইন কেটে দিলো।

ডিআইজি সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কথা বললেন, কাল রাতেই তিনি বলে রেখেছিলেন মাহমুদ হোসেনের বাড়ির সব টেলিফোন যেন ট্যাপ করা হয়। টেলিফোন অফিস থেকে তাকে একটু পরে জানানো হলো–কলটা এসেছিলো চট্টগ্রাম থেকে। রেল স্টেশনের কার্ড ফোন বুথ থেকে ওটা করা হয়েছে।

বাবা শুনে আঁতকে উঠলেন–তার মানে, বনি বিনিকে চট্টগ্রাম নিয়ে গেছে শয়তানরা?

ডিআইজি সেলিম বললেন, উত্তেজিত হয়ো না। এটা যদি কোন গ্যাঙ হয়, আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য ঢাকা থেকে কল না করে চট্টগ্রাম থেকে করার জন্য ওদের কাউকে বলে দিয়েছে।

মা বিড় বিড় করে বললেন, আল্লাহ, যেন তাই করে। আমার বনি বিনি যেন ঢাকায় থাকে।

ওপাশে টেলিফোন রিসিভার রেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো টেকো গুণ্ডা। কালো গুণ্ডাকে বললো, কেমুন বুদ্দি বাইর করছি ক? হুজুর গো থনে ট্যাকা লয়া অগরে এক দফা বেচছি। অখন বাপের থনে বাইর করুম দস লাখ। আমগোরে আর পায় কে!

কালো গুণ্ডা স্বীকার করলো হ উস্তাদ, তোমার জবর বুদ্দি! এ্যার লাইগা পোলা মাইয়া গো কতা তুমি ক্যাসেটে তুইলা রাখছ!

জলদি যা! ইয়ার কণ্ডিসন কুচে ঢাকার টিকিট কাট। ফাইনাল খেলা খেলুম ঢাকায় গিয়া।

টেকো আর কালো দুজনই ভাড়াটে গুণ্ডা। ওদের তিরিশ হাজারে ভাড়া করেছিলো আবদুল মালেক। কথা ছিলো বনি বিনিকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার। মালেক জানতো মাহমুদ হোসেনের ছেলেমেয়েরা নিখোঁজ হলে সারা শহর তোলপাড় হবে। তাই ঢাকা স্টেশন থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন না ধরে জয়দেবপুর থেকে মালগাড়ি ধরেছে। জয়দেবপুরের সিগন্যালে বলা ছিলো মালগাড়িটা স্টেশনে ঢোকার আগে দুমিনিটের জন্য যেন থামানো হয়। এর জন্য পাঁচশ টাকা লেগেছে। টেকো কালো বনিদের নিয়ে চট্টগ্রাম গেছে আর মালেক মাইক্রোবাসে ঢাকা ফিরে এসেছে।

চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে বিনির সঙ্গে কথা বলে টেকো যখন বুঝতে পারলো ওরা বড়লোকের ছেলেমেয়ে তখনই ও মতলব এঁটেছে বনি বিনিকে আরেক দফা বেচবে।

রাত আটটার দিকে টেকো আবার ফোন করলো বনিদের বাড়িতে। প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে বাবা মা অপেক্ষা করছিলেন ওর টেলিফোনের জন্য। প্যারালাল লাইনে কথা শুনছিলেন ডিআইজি সেলিম তরফদার।

টেকো বললো, ট্যাকা ম্যানেজ করছেন?

করেছি। কোথায় দিতে হবে বলুন।

ট্যাকা লয়া রাইত দসটার সুম বুড়িগঙ্গার বিরিজের উপরে আইবেন। পুলিসরে যদি খবর দেন, আর যদি কুন ফন্দি ফিকির করেন পোলা মাইয়া দোনজনরে কাইটা গাঙ্গে ফালাইয়া দিমু।

না না, পুলিসকে বলবো না। প্লীজ বনি বিনিকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দিন।

হোনেন কতা। বলে টেকো ক্যাসেট অন করলো। বাবা বনির কান্নাভেজা গলা শুনলেন–আব্ব আমাদের নিয়ে যাও। বিনিও ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, ওরা টাকা যা চায় দিয়ে দাও! নইলে আমাদের মেরে ফেলবে।

টেকো ক্যাসেট বন্ধ করে বললো, কী মুক্তিযুদ্ধা সাব, বিশ্বাস ওইছে?

হয়েছে। আমি টাকা নিয়ে আসছি।

মনে থাকে যেন। রাইত ঠিক দসটা। কী গাড়ি লয়া আইবেন?

সাদা পাজেরো। আপনার গাড়ি কোনটা?

যখন দেখবেন তখন জানবেন আমার গাড়ি কোনটা। আমারে আপনের চিননের কাম নাই। টেকো রিসিভার নামিয়ে রেখে পাশে দাঁড়ানো কালো গুণ্ডাকে বললো, আবে কাউলা, একখান গাড়ি জোগাড় করন লাগে যে?

ক্যা, গাড়ি দিয়া কী করবা?

বাপে কয় আপনের গাড়ি কোনটা! হ্যায় আইবো সাদা পাজেরো লয়া।

জাগা মত ট্যাকা রাইখ্যা হ্যারা চইলা যাইবো। আমরা গিয়া খাতির জমা ট্যাকা লইয়া ভাম । আমাগো হুণ্ডায় গ্যালেই ত অয়!

আরে ব্যাক্কল! দস লাখ টাকা লয়া তুই হুণ্ডায় যাবি! এর উপরে কেউ বাটপারি করলে?

একটু চিন্তা করে কালো গুণ্ডা বললো, ন্যাটা মজনুর গ্যারেজ থেইকা একটা গাড়ি লইবার পারো! তুমি কইলে দিবো!

চল যাই, গ্যারেজ না আবার বন্ধ কইরা দ্যায়।

ওরা টেলিফোন করেছিলো হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের টেলিফোন বুথ থেকে। হোণ্ডা নিয়ে টেকো আর কালো গুণ্ডা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখলো পুলিসের জিপ এসে ভেতরে ঢুকলো। একজন অফিসার জিপ থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌড়ে গেলেন টেলিফোন বুথের দিকে। বুথের ভেতর তখন এক মোটাসোটা বিহারী মহিলা চেঁচিয়ে কারও সঙ্গে ঝগড়া করছিলেন।

সন্দেহজনক কাউকে না পেয়ে অফিসার তার পকেট থেকে সেলুলার ফোন বের করে ডিআইজি সেলিম তরফদারকে বললেন, স্যার, সাসপিশাস কাউকে বুথের কাছে পেলাম না।

গেটের বাইরে রিকশার আড়াল থেকে টেকো আর কালো গুণ্ডা সব দেখলো। ওদের বুঝতে বাকি রইলো না পুলিস কাকে খুঁজছে। টেকোর মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। পিজি হাসপাতালের বুথ থেকে বনির বাবাকে টেলিফোন করে জানালো, পুলিসরে খবর দিয়া আপনে ঠিক কাম করেন নাই। আইজকা আর পোলা মাইয়ার মুখ দ্যাখন আপনের কপালে নাই।

ওপাশ থেকে ব্যস্ত গলায় বাবা বললেন, আপনারা বিশ্বাস করুন আমি পুলিসকে কিছুই বলিনি। আপনাদের টাকা রেডি আছে। দয়া করে বলুন, বনি বিনিকে আনার জন্য কোথায় যাবো?

কাইল কমু নে।বলে টেলিফোন রেখে ওরা হোণ্ডা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

.

০৪.

সকালে পাহাড়তলীর আগে ট্রেন থামিয়ে টেকো আর কালো গুণ্ডা বনি বিনিকে নিয়ে নেমে পড়েছিলো। পাহাড়তলীর এক বাড়িতে বনি বিনিকে পৌঁছে দেয়ার কাজ ঠিক মতো সেরে ওরা ঢাকায় ফোন করেছে।

এক রাতের ধকলে বনি বিনির মুখ শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেছে। বাড়ির ভেতর খুব কালো আর মোটাসোটা এক মহিলা রান্না করছিলো। বসার ঘরে তিনজন লোক বসে তাস খেলছিলো। বনি বিনি দুজনই লক্ষ্য করেছে সিনেমার ভিলেনদের মতোই নিষ্ঠুর চেহারা লোক তিনটার। দেখেই মনে হয় প্রাণে দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই। বনি বিনিকে নিয়ে টেকো যখন ঘরে ঢুকলো, শুকনো বয়স্ক লোকটা চেঁচিয়ে বললো, আঞ্জুমনের মা, কোনআনে গেলা? জলদী আইও, তোমার মেহমান আইসছে।

মহিলা শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বসার ঘরে এসে বললো, আইছে ভালা কতা। তোমরা পাহারা দিবা। কিছু ওইলে আমি জানি না।

অল্প দাড়িওয়ালা লোকটা বনি বিনিকে ভেতরের একটা কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিলো।

বেলা তখন দশটা বাজে। বনি বিনির খুব খিদে পেয়েছিলো। বাড়িতে থাকলে এতক্ষণে নাশতা খাওয়া হয়ে যেতো! নাশতা খাওয়ার সময় বনির কত বায়না! এই সিরিয়াল খাবে না। পাউরুটিতে মাখন খাবে না, দুধ খাবে না, ডিম খাবে ওষুধের মতো নাক সিঁটকে–এসব দেখে বড় চাচী ওর পছন্দ মতো ব্রেকফাস্ট মেন্যু বানিয়ে দিয়েছেন। বনি ভাবলো বাড়ি ফিরে গেলে আর কোনো দিন সকালের নাশতা নিয়ে খুঁত খুঁত করবে না।

সাড়ে দশটার দিকে একটা থালায় চারটা আটার রুটি আর দু গ্লাস পানি এনে মোটাসোটা আমনের মা জানালার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ওদের খেতে দিলো। বাজখাই গলায় বললো, ভালো চাও তো ঠিক মত খাই লও। আমারে পেরেশানি কইরলে কপালে খারাপি আছে কইলাম।

যে রকম রংচটা ময়লা টিনের থালায় ওদের খেতে দিয়েছে বিনি ভেবেছিলো খাবে । বনি সঙ্গে সঙ্গে শুকনো রুটি মুখে দিয়ে চিবোতে গিয়ে বিষম খেলো। বিনি নিচু গলায় বললো, বনি ভাইয়া, এভাবে না, পানি দিয়ে ভিজিয়ে খা। তাহলে গলায় আটকাবে না।

বনির খাওয়া দেখে বিনিও এক খানা রুটি ছোট ছোট করে ছিঁড়ে মুখে দিলো। যতটা খারাপ লাগবে ভেবেছিলো ও, ততটা খারাপ লাগলো না। রুটি দুটো খেয়ে ওদের খিদের জ্বালা দূর হলো।

বিনি তাকিয়ে দেখলো ঢক ঢক করে পুরো এক গ্লাস পানি খেয়েছে বনি। বাড়িতে এই পানি খাওয়া নিয়েও বনির কত বায়নাক্কা। এমনি পানি খাবে না, সি ভিটা নয় কোক খাবে। পানি খাওয়ার জন্য মা কত বকেন ওকে! আজ ওর পানি খাওয়া দেখে বিনির মায়া লাগলো। আহা বেচারা ছোট ভাইটা! ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি ছেলেধরার পাল্লায় পড়ে ওদের এভাবে কষ্ট পেতে হবে।

বিনির কাছে এসে বনি ফিশফিশ করে বললো, আমরা এদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারি না?

কী ভাবে পালাবো?

রাস্তা দিয়ে কোথাও নেয়ার সময় যদি চিৎকার করি–বাঁচাও, আমাদের ছেলেধরা নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে নিশ্চয় লোকজন আমাদের বাঁচাতে আসবে?

কাল ওরা কী বললো শুনিস নি? চ্যাঁচামেচি করলে ছুরি দিয়ে কেটে দু টুকরো করে ফেলবে।

আমাদের দু টুকরো করলে ওরা বুঝি বাঁচতে পারবে?

ওরা নিজেদের জানের পরোয়া করে না। তাছাড়া গুণ্ডাদের কাছে সব সময়। রিভলভার, পিস্তল, বন্দুক এসব থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে কী যেন ভাবলো বনি। তারপর আগের মতো নিচু গলায় বললো, ওরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

রাস্তা দিয়ে আসার সময় দেখেছি এটা চট্টগ্রামের পাহাড়তলী।

আমাদের কতদিন এভাবে আটকে রাখবে?

টেকো গুণ্ডা আমাদের ভয়েস রেকর্ড করেছে। আমার মনে হয় ওরা আমাদের আটকে রেখে বাবার কাছে টাকা চাইবে।

তোর কি মনে হয় বাবা ওদের কথা মতো টাকা দেবে?

কেন দেবেন না? বাবা মা আমাদের কি কম ভালোবাসেন?

টাকা নিয়ে ওরা যদি আমাদের মেরে ফেলে?

আমাদের ফেরত না দিলে বাবা টাকা দেবেন কেন?

বনি বিনিকে ফেরত না দিয়ে কীভাবে বাবার কাছ থেকে টাকা আদায় করা যায় এ নিয়ে টেকো আর কালো গুণ্ডা অনেক ভেবেছে। রাতে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল থেকে ফোন করে বেরোবার সময় পুলিস দেখে ওদের মনে হয়েছিলো বনিদের বাবা বুঝি পুলিসকে জানিয়েছে। পরে টেলিফোনে যখন তিনি মানা করলেন, কথাটা টেকো উড়িয়ে দিতে পারলো না। তাঁর মতো বড়লোক দশ লাখ টাকার শোকে

নিশ্চয় কাতর হবেন না। ছেলেমেয়ের জানের কথা বিবেচনা করলে দশ লাখ তাঁর কাছে কোনো টাকাই না।

রাতে ওদের কলতা বাজারের ডেরায় বসে দেশী মদ খেতে খেতে টেকো আর কালো এসব কথাই বলাবলি করছিলো। কালো বললো, উস্তাদ, পোলা মাইয়ারে না দেইখা অরা ট্যাকা দিব ক্যান?

না দিলে অগো জানে মাইরা ফালামু।

কেমনে মারবা উস্তাদ? অগোরে তো তুমি হুজুরগো মাইনষের জিম্মায় রাইখা আইছ।

তয় কী? হ্যাঁগোরে কই রাখছি এক জানস তুই আর জানে হুজুররা। হ্যাঁগো বাপে জানবো ক্যামনে? বাপেরে পোলা মাইয়ার কতা হুনায়া দিছি। হ্যারা জানে পোলা মাইয়া আমগো কাছে।

তয় দেরি করতাছ ক্যান উস্তাদ? আইজ রাইতেই তো ট্যাকাটা লইবার পারতা।

চিন্তিত গলায় টেকো বললো, হ, পারতাম! মগর ওই যে ধান্দা লাগলো, বাপে আবার পুলিসরে খবর দিছে কিনা বুইঝা লইলাম।

কাইল লইবা?

কাইল না! আরও একদিন যাউক। বাপের পেরেসানি বাড়ুক। তয় দেখুম।

হুজুর হালারা ট্যার পাইলে ঝামেলা করবার পারে।

এত ডরাস ক্যা তুই!

সারা রাত মদ খেয়ে বেলা বারোটা পর্যন্ত বেহুশের মতো ঘুমিয়েছিলো টেকো আর কালো। ঘুম থেকে উঠে ওসমানিয়া হোটেলে নেহারি আর তন্দুরি খেয়ে ওরা প্রথমে গেলো ন্যাটা মজনুর গ্যারেজে। কাল রাতের জন্য একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করলো পাঁচ হাজার টাকায়। এমনিতে বারো ঘন্টার ভাড়া বারোশ টাকা। ন্যাটা মজনু পরিষ্কার বললো, তোমরা আকাম কুকাম করনের লাইগা গাড়ি নিতাছ। বহুত রিস্কের কারবার। পাঁচ হাজারের কমে ওইবো না।

ন্যাটা মজকে মনে মনে কয়েকটা খারাপ গালি দিয়ে টেকে! বললো, ঠিক আছে, পাঁচ হাজারই দিমু মগর কামের বাদে।

আলপিন দিয়ে দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করতে করতে ন্যাটা বললো, উঁহু! আদ্দেক এ্যাডভান্স দেঅন লাগবো।

ওকে আবার আগের মতো কতগুলো গালি দিয়ে টেকো পকেট থেকে আড়াই হাজার টাকা বের করে দিয়েছে। গত কাল ওরা আবদুল মালেকের কাছ থেকে তিরিশ হাজার পেয়েছে। আগামী কাল রাতে

পাবে দশ লাখ। এত হিসেব করলে চলবে কেন! পথে আসতে আসতে এসব কথা কালো গুণ্ডাকে বোঝাতে হয়েছে। কালোর মাথায় আবার বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম। টেকো অবশ্য মনে করে ওর জন্য কম বুদ্ধিওয়ালা চ্যালাই ভালো। বুদ্ধি কম থাকলে বেশি বাধ্য হয়।

পরদিন রাত আটটায় টেকো ফোন করলো বনি বিনির বাবাকে। বললো, রাত ঠিক সাড়ে দশটায় টাকাটা একটা কালো ব্যাগে করে রমনা পার্কের পানির ট্যাঙ্কের তলায় রাখতে। টাকা গুণে দেখার পর সাড়ে এগারোটায় বনি বিনিকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হবে।

বাবা আর্ত গলায় বললেন, টাকা নিয়ে যদি ওদের ফেরত না দাও, তোমার কথায় বিশ্বাস কী?

বিশ্বাস করন ছাড়া আপনের কুন উপায় আছে? আমি যেমুন কমু তেমুনই করন লাগবো।

আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কতা একবার হুনছেন না? আবার কী?

ওদের কথা না শুনলে আমি এক পয়সাও দেবো না।

বাবার গলা শুনে দমে গেলো টেকো। ঠিক আছে, খাড়ান অগো ডাকতাছি। এই বলে কালোকে তাড়াতাড়ি ক্যাসেট রিউইন্ড করতে বললো। ভাগ্যিস গান শোনার জন্য ক্যাসেটটা সঙ্গে রেখেছিলো কালো।

রিউইন্ড করার পর টেকো বললো, চুপচাপ হুনেন অগো কথা। মইদ্যে কুন কতা কইবার পারবেন না।

বাবা আগের মতো বনির কান্নাভেজা কথা শুনলেন–আব্বু আমাদের নিয়ে যাও। তারপর বিনির ঠিক আগের মতো ফোঁপানো গলা। বাবা চিৎকার করে বললেন, বিনি, একবার আব্বু বলো! মা, একবার আব্বু বলো! কোনো উত্তর পেলেন না।

টেকো বললো, কতা হুনছেন, ট্যাকা লয়া ঠিক সময় ঠিক জাগায় রাইখ্যা আইসেন। নাইলে এ জনমে আর পোলা মাইয়াগো চোখে দেখবেন না।

টেকো টেলিফোন রাখতেই বাবা তাঁর বন্ধু ডিআইজি সেলিমকে বললেন, সেলিম, আমি হলপ করে বলতে পারি এটা বনি বিনির রেকর্ড করা গলা। ওদের আগের কথা আমার মনের ভেতর গেঁথে আছে। প্রত্যেকটা শব্দ, প্রত্যেকটা উচ্চারণ, কান্না সব আমার মেমরিতে রয়েছে।

ডিআইজি সেলিম গম্ভীর হয়ে বললেন, আগের বারও ওদের ক্যাসেটে রেকর্ড করা গলা শুনেছি।

তাহলে কি বনি বিনি এদের হাতে নেই?

হাতে না থাকলে গলা রেকর্ড করবে কী ভাবে? আমার মনে হয় ওদের কোনো ঘাঁটিতে বনি বিনিকে আটকে রেখেছে।

টাকা দিলেও যদি ফেরত না দেয়।

যদি বলছিস কেন? আমি নিশ্চিত যে দেবে না।

তাহলে?

টাকা নিতে যখন আসবে তখনই ধরে ফেলবো।

কিন্তু আমার বনি বিনি?

ধরে একটা রাম ধোলাই দিলে সুড় সুড় করে বলে দেবে বনি বিনি কোথায়।

ডিআইজি সেলিম হিসেবে একটু ভুল করেছিলেন এখানে। টেকো কালোর তখন জানার কথা নয় বনি বিনি কোথায়। সেদিন সকালেই ওদের পাহাড়তলীর বাড়ি থেকে অজ্ঞান করে নিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পোর্ট কলোনির এক বাংলোয়। মালেকদের দলের এক নেতার বিরাট ওষুধ কোম্পানি আছে । প্রতি মাসে বড় চালানের ওষুধ রফতানি হয় আরব দেশগুলোতে। ওখান থেকে আসে ওষুধের কাঁচা মাল। অন্তত বন্দরের সাধারণ লোকজন তাই জানে।

মাত্র অল্প কয়েকজন বন্দর কর্মী জানে ইবনে আবু ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির বড় বড় ওষুধের বাক্স যেগুলোর গায়ে ইংরেজি আর আরবিতে লেখা থাকে সাবধান, ভঙ্গুর জিনিস, সেগুলোর ভেতরে থাকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। ক্রেনে খুব সাবধানে ওসব বাক্স জাহাজে তুলতে হয়। আল জেদ্দাহ শিপিং লাইন্স-এর মালিক আবদুল মালেকদের দলের শুভাকাঙ্খী। জাহাজের ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে ক্রুরাও তাই। ইবনে আবু ফার্মাসিউটিক্যালস-এর এসব ভঙ্গুর মাল খুব সাবধানে পৌঁছে যায় বিভিন্ন আরব বন্দরে।

আল জেদ্দাহ শিপিং লাইন্সের যে জাহাজটা সেদিন চট্টগ্রাম থেকে বোম্বে, করাচি হয়ে মাশকাত যাওয়ার কথা সেটার সামনে দুপুরে জনা পাঁচেক লোক কথা বলছিলো। এরা সবাই আবদুল মালেকদের দলের লোক। একজন ছিলো আরব, বাকিরা এ দেশী।

এদের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই এরা যে আবদুল মালেকদের পার্টির লোক। খুবই স্মার্ট চেহারা, প্যান্ট শার্ট পরা, মুখে দাড়ির চিহ্নমাত্র নেই, দুজনের আবার ঝোলা গোঁফ, দেখে মনে হয় সরকারী দলের মাস্তান। এরা সবাই গড় গড় করে আরবি বলতে পারে।

আরবটা বললো, গতবার তোমরা ভালো মাল দাওনি। তোমাদের বার বার বলেছি ফকির মিসকিনদের বাচ্চা দিও না। ওরা না খেয়ে অপুষ্টিতে ভোগে। উটের দৌড় শুরু হওয়ার একটু পরেই মরে যায়। আমাদের দরকার শক্ত, স্বাস্থ্যবান বাচ্চা। বড়লোকদের বাচ্চা।

ঝোলা গোঁফ বললো, আপনাদের জানা উচিৎ বড় লোকদের বাচ্চা চুরি করা কী কঠিন কাজ। ওদের চাকর, দারোয়ান, ড্রাইভার, আর্দালিরা সারাক্ষণ ওদের ঘিরে রাখে। তবু এবার দুটো বড়লোকের বাচ্চা আপনাদের দিতে পারবো। চেহারা সুরত খুবই সুন্দর, আদব তমিষ জানে। মেয়েটার বয়স বারো তেরো হবে, ছেলেটার বয়স ছয় সাত, এখনও দুধের দাঁত পড়েনি।

আরবটা আহ্লাদে আটখানা হয়ে দাঁত বের কর হাসলো–শুকুর আলহামদুল্লিাহ! এরকমই দরকার আমাদের।

আপনি জেনে আরও খুশি হবেন এই বাচ্চা দুটি আমাদের এক খাস দুশমনের ছেলে মেয়ে।

আরবটা এবার বললো, মারহাবা, মারহাবা! এর জন্য তোমাদের অনেক ইনাম মিলবে।

ইনামের কথায় ঝোলা গোঁফের মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না। বললো, গতবার আপনারা রিভলবার আর রাইফেলের গুলির যে চালান পাঠিয়েছিলেন, ওটা পুরোনো স্টকের। গ্রেনেড তো অর্ধেকই ফাটেনি।

আমি দুঃখিত! ইসরাইলি ইহুদিটা এবারও আমাদের ঠকিয়েছে। ওর কাছ থেকে আর মাল কেনা যাবে না।

আপনারা সরাসরি ইসরাইলের সরকারের কাছ থেকে কেনেন না কেন? তাহলে দামও কম পড়বে, জিনিসও ভালো হবে।

জানাজানি হলে কেয়ামত হয়ে যাবে।

জানাজানি কেন হবে? অন্য কোনও দেশ থেকে কিনবেন। ইউরোপের বহু দেশে ওদের ডিলার আছে।

ঠিক আছে, তোমার কথা মনে থাকবে। ওই বাচ্চা দুটো আলাদা বাক্সে রেখেছো তো?

জ্বি জনাব, ওই বাক্সটার গায়ে দুটো সবুজ দাগ আছে। ওটা ওপরে রাখতে বলেছি।

দুপুরের দিকে জাহাজ যখন চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়লো বনি বিনি কিছুই টের পেলো না। ইবনে আবু ফার্মাসিউটিক্যালস-এর একটা বিশেষ ধরনের বাক্সের ভেতর ওরা তখন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলো।

৫-৬. রমনা পার্কের উত্তর দিকের গেট

রাত সাড়ে দশটার সময় রমনা পার্কের উত্তর দিকের গেট-এর সামনে মাইক্রোবাস রেখে টেকো কালো অন্ধকারে গাছের আড়ালে আড়ালে থেকে পানির ট্যাঙ্কের তলায় এলো ব্যাগটা নেয়ার জন্য।

নিশ্চিত হওয়ার জন্য টেকো অল্পক্ষণের জন্য টর্চ জ্বেলে দেখে নিলো, কালো একটা কাপড়ের ব্যাগ ঠিকই রাখা আছে। এই ব্যাগের ভেতর দশ লাখ টাকা থাকার কথা। কালোকে ও আগেই বলে রেখেছে রিভলভার হাতে আড়াল থেকে ওকে কভার দেয়ার জন্য। পুলিসকে খবর না দিলেও অন্য পার্টিও তো আঁচ করতে পারে! আজকাল এসব কারবারে নিয়ম রীতি বলে কিছু নেই। চুরির ওপর বাটপারি হরদম লেগেই আছে। ন্যাটা মজনুর পেট পাতলা, কথা হজম করতে পারে না। আরেক পার্টির কাছে হয়তো গল্প করতে পারে কাউলার ওস্তাদ পাঁচ হাজার টাকায় এক রাতের জন্য মাইক্রোবাস ভাড়া করেছে। আর কিছু বলতে হবে না। এতেই পেছনে ফেউ লেগে যাবে।

খুব সাবধানে চোখ কান খোলা রেখে টেকো গুন্ডা কালো ব্যাগটার কাছে এলো। আগের রাতে এসে ও রেকি করে গেছে। রমনা পার্কের এদিকটায় আলোর ছিটেফোঁটা নেই। সাধারণ লোক এই অন্ধকারে ঢুকতেই সাহস পাবে না। টেকোর ওস্তাদ বলতো ওর চোখ নাকি পঁাচার মতো, অমাবস্যার অন্ধকারে রাস্তা থেকে আলপিন কুড়িয়ে নিতে পারে। ওর চলাফেরাও বেড়ালের মতো, এক রত্তি শব্দ হয় না।

টর্চ একটা হাতের পাঁচ রাখতে হয়। টেকো আর ওটা জ্বালালো না। ব্যাগের ওপর হাত দিয়েই ও বুঝে ফেলেছে নোটের বান্ডিল। টাকা যখন এনেছে না গুণেই টেকো বলে দিতে পারে পুরো দশ লাখই আছে। ব্যাগটা বগলদাবা করে বনবেড়ালের মতো দ্রুত গতিতে ও পার্ক থেকে বেরিয়ে এলো।

কালোর চোখে টেকোর মতো ধার নেই। ও শুনেছে পর পর দুবার প্যাচা ডেকেছে। যা বোঝার ও বুঝে নিয়ে আর কোনও দিকে তাকালো না। এক দৌড়ে ও মাইক্রোবাসের কাছে চলে এলো।

টেকো ততক্ষণে ড্রাইভিং সিটে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে। কালো উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে সত্তর মাইল স্পিডে গাড়ি চালালো। রাতের এই সময়ে রাস্তা ঘাট ফাঁকা থাকে। গাড়িওয়ালাদেরও ঘরে ফেরার তাড়া থাকে। লিমিট ভেঙে বেশি জোরে চালালেও পুলিস খুব একটা গা করে না। ওদের নজর থাকে ট্রাকের দিকে। দূর পাল্লারট্রাক রাত বারোটার আগে শহরে ঢুকলেই পুলিস ওদের ধরবে। নিজের নিখুঁত পরিকল্পনার সাফল্যে নিজেই হা হা করে হাসলো টেকো। বললো, তুই তো পাতলা খান লেনের জগু উস্তাদের লগে কাম করছস। এমন ফাইন কাম আগে দ্যাখছস কাউলা?

না উস্তাদ। গদ গদ হয়ে কালো বললো, তুমার বেরেনের লগে জগু উস্তাদ ক্যা, কলুটোলার দিলবর উস্তাদ বি কিছু না।

টেকো ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেনি গতকালই শহরের সব কটা কার্ড ফোন বুথে ডিআইজি সেলিম তরফদার গোয়েন্দা বসিয়ে দিয়েছিলেন। টেকো প্রত্যেকবারই কার্ড টেলিফোন ব্যবহার করেছে আর যে সব বুথেই গেছে যেগুলোর আশে পাশে উর্দিপরা পুলিস নেই। ও কীভাবে জানবে, ফকির, কলাওয়ালা, ঝাড়ুদারনি–যারা ওর নজর এড়িয়ে গেছে ওরা সবাই ছিলো পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের! দুপুরের ভেতর সেলিম তরফদারের জানা হয়ে গেছে টেকো আর কালোর যাবতীয় গতিবিধি। তিনি এই দুজনের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে জানার অপেক্ষা করছিলেন দলে আর কেউ আছে কিনা। সেজন্য তাঁর দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন টেকো কালোর কলতাবাজারের ডেরার চারপাশে।

রমনা পার্ক থেকে কলতাবাজার আসতে টেকোর দশ মিনিট সময় লাগলো। রেড সিগন্যালে থামতে না হলে আরও আগে আসতে পারতো। জোরে চালালেও শহরের ভেতর ট্রাফিক আইন ভাঙা চলবে না–এ শিক্ষা ওর আছে। অকারণে কারো মনে সন্দেহ জাগানোর কোনো মানে হয় না।

কলতাবাজারের চালের গুদামের পাশে মাইক্রোবাস থামিয়ে টাকার ব্যাগ বগলে নিয়ে টেকো আর কালো যখন ওদের ডেরায় এসে ঢুকলো তখনও কিছু টের পায়নি। ডিআইজির ফোর্স হিসেবে যারা এসেছে তারা সবাই ছিলো প্লেন ড্রেস-এ, তাও আড়ালে আবডালে। আসার সময় টেকো শুধু লক্ষ্য করেছে কোনো গাড়ি ওদের অনুসরণ করে কিনা। এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে ও কলতাবাজার আসতো না।

ঘরে ঢুকে টাকার ব্যাগটা আগে স্টিলের আলমারিতে তুলে রাখলো টেকো গুন্ডা। কালোকে বললো, আইজ বিলাতি বাইর কর! বিলাতি খামু। হা হা হা!

কালো কাচুমাচু করে বললো, উস্তাদ, গুইনা দেখবা না ঠিক মতো ট্যাকা দিছে কি না।

আরে ব্যাক্কল! না দিলে অর পোলা মাইয়া আস্ত থাকবো! জানে মাইরা ফালামু না?

কালো তবু আবদার করলো আমারে একবার দেখবার দ্যাও উস্তাদ। বাপের জমে এক লগে দস লাখ টাকা দেখি নাই ক্যা।

চাবিটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিলে টেকো–যা দ্যাখ গা! তরে লয়া আর পারি না। এই বলে ও নিজেই তাক থেকে বিলেতি মদ আর অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস নামালো।

কালো লোহার আলমারির তালা খুলছে আর টেকো পুরো এক গ্লাস মদ ঢক ঢক গলায় ঢেলেছে, ঠিক তখনই ঘরের ভেতর যেন বোমা ফাটলো–যেভাবে আছো ঠিক সেভাবে থাকো। নড়াচড়া করলে মাথার খুলি উড়ে যাবে।

কোতোয়ালি থানার দারোগা রহিম বক্স পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকলেন। তার সঙ্গে রাইফেল ধারী জনা চারেক পুলিসও ভেতরে ঢুকলো।

টেকোর গ্লাস ধরা হাতেই হাতকড়া পরালেন দারোগা। কালোকেও একই সঙ্গে হাতকরা পরানো হলো। কালো ফিশ ফিশ করে শুধু বললো, উস্তাদ!

টেকো তিক্ত হেসে বললো, খেল খতম। ওর মাথা তখন ঝিম ঝিম করছিলো।

ওদের দুজনকে প্রথমে কোতোয়ালি থানায় আনা হলো। ডিআইজি সেলিম সেখানে বনি বিনির বাবা আর অমল কাকুকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। টেকো আর কালোকে ডিআইজির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দারোগা বললেন, দুটোই দাগী আসামী স্যার।

আগে বেশ কয়েকবার হাজত খেটেছে।

ডিআইজি ঠান্ডা গলায় বললেন, আর হাজত খাটার কষ্ট দেবো না ওদের। বনি বিনিকে কিডন্যাপ করার জন্য ফাঁসির দড়ি তৈরি হচ্ছে।

কালো গুন্ডা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো–হুজুর মা বাপ! আমগো কুন দুস নাই। মগবাজারের হুজুরে তিরিশ হাজার টাকা দিছে।

বনি বিনি এখন কোথায়?

কালো ওর ওস্তাদের দিকে তাকালো। ডিআইজিকে থানায় উপস্থিত দেখেই টেকো বুঝে ফেলেছে কেস খারাপ। ভেতরে ভেতরে ভয় পেলেও চেহারায় একটা শক্তভাব এনে দাঁড়িয়েছিলো ও। কালো ওর দিকে তাকাতেই পেটের ভেতর দারোগার রুলের গুঁতো খেয়ে আঁক করে উঠলো। দারোগা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, হারামজাদা, ভালো চাস তো কথার ঠিক ঠিক জবাব দে!

রুলের একগুঁতো খেয়েই কালো গড় গড় করে সব বলে ফেললো। কীভাবে আবদুল মালেক ওদের ভাড়া করেছিলো, পাহাড়তলীর কোন বাড়িতে বনি বিনিকে রেখে এসেছে, টেকো কীভাবে দশ লাখ টাকা হাতাবার প্ল্যান করেছে–কিছুই বলতে বাকি রাখলো না।

টেকো কালোকে লক আপ-এ ঢুকিয়ে ডিআইজি সেলিম তখনই ফোন করলেন চট্টগ্রামের এসপিকে। এসপি বললেন, স্যার, আমি এক্ষুণি পাহাড়তলীর বাড়ি রেইডের ব্যবস্থা করছি।

বনি বিনির বাবা আশা করছিলেন চট্টগ্রামের এসপি পাহাড়তলীর বাড়ি থেকে ওদের উদ্ধার করবেন। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি সিগারেট ধরালেন। অমল কাকুকে বললেন, বনিদের খবর পেলে আমি আজ রাতেই চিটাগাং যাবো।

অমল কাকা বললেন, তুই একা যাবি কেন? আমিও যাবো তোর সঙ্গে।

আধঘন্টা পরই চট্টগ্রামের এসপি ফোন করলেন। পাহাড়তলীর বাড়ি বাইরে থেকে তালা দেয়া। পাশের বাড়ির লোকজন বললো, এ মাসেই নাকি আঞ্জুমনের বাবা মা ও বাড়িটা ভাড়া করেছিলো। বিকেলে ওরা তালা বন্ধ করে গ্রামের বাড়ি গেছে, দুদিন পর ফিরবে। দুটো ছোট ছেলেমেয়েকে পাশের বাড়ির এক বুয়া দেখেছে সকালে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিতে। নাকি আঞ্জুমনের খালাতো ভাইবোন।

ডিআইজি বললেন, হাসপাতাল-টাতাল বাজে কথা। চিটাগং আর আশে পাশে ওদের সবগুলো আস্তানা রেইড করুন। সকালে আমাকে ফোন করবেন।

বাবা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, ওদের সত্যি সত্যিই তো কোনো অসুখ করতে পারে! হাসপাতালগুলোতে দেখলে হয় না?

ডিআইজি গম্ভীর হয়ে বললেন, কাজটা করিয়েছে আবদুল মালেক। বুঝতে পারছিস না এটা একটা পলিটিক্যাল ব্যাপার! চট্টগ্রাম ওদের ঘাঁটি। কম্বিং অপারেশন চালালেই বেরিয়ে পড়বে বনিদের কোথায় লুকিয়েছে।

আমি কি চট্টগ্রাম যাবো?

নরম গলায় বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন, এখন গিয়ে কী করবি? বাড়ি ফিরে যা। বনি বিনির মার কাছে থাক। খবর পেলেই তোকে জানাবো।

বনি বিনির জন্য বাবার বুকের ভেতর সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিলো। রাত এখন বারোটা। কে জানে কোথায় কিভাবে ওদের রেখেছে শয়তানরা! অমল কাকু ওঁর বন্ধুকে ধরে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

ঠিক তখনই জ্ঞান ফিরেছিলো বিনির। ওর মনে হলো লম্বা একটা ঘুম দিয়েছে সে। মাঝখানে অল্পক্ষণের জন্য ঘুম ভেঙেছিলো। অন্ধকার দেখে ভেবেছে ভোর হয়নি, তাই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন বুঝতে পারেনি ও যে বাড়িতে নেই।

জ্ঞান ফেরার পর প্রথমে মনে হলো ওর বিছানাটা সামান্য দুলছে। চোখে মেলে তাকিয়ে দেখলো, বিছানা কোথায়? কাঠের মেঝের ওপর পড়ে আছে ও। হাত দিয়ে চোখ কচলাতে যাবে, তখন টের

পেলো ওর হাত দুটো বাঁধা। অবাক হয়ে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো ওর আর বনির মতো আরও কয়েকটা ছেলেমেয়ে, সবার হাত বাঁধা, মেঝের ওপর অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ধীরে ধীরে ওর সব মনে পড়লো। মেলা থেকে দাড়িওয়ালা শয়তান আর দুটো গুন্ডা কীভাবে ওদের ধরে এনেছে, কীভাবে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর বাড়িতে এসেছে, সেখানে কী দেখেছে–সবই ওর মনে পড়লো। শুধু বুঝতে পারলো না এখানে কীভাবে এলো। পাহাড়তলীর বাড়িতে সকালে এক ডাক্তার এসে বনি আর ওকে দুটো ইনজেকশন দিয়েছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

বিনি চারপাশে তাকিয়ে ব্যাকুল হয়ে বনিকে খুঁজলো। ঘরের ভেতর কম পাওয়ারের আলো ছিলো। প্রথমে সব আবছা আবছা মনে হলো। শোয়া থেকে অতি কষ্টে উঠে বসলো বিনি। বার কয়েক চোখ বন্ধ করলো আর খুললো। এবার কিছুটা পরিষ্কার হলো ঘরের ভেতরটা। চারদিকে কোনও জানালা নেই, শুধু দুটো দরজা। ঘরের ছাদটাও খুব নিচু।

এক কোণে কাঠের দেয়াল ঘেঁষে পড়েছিলো বনি। তখনও ওর জ্ঞান ফেরেনি। বিনি এবার উঠে দাঁড়ালো। স্কুলে সব সময় স্পোর্টস-এ ও দু তিনটা মেডেল পায়। বনির চেয়ে ওর গড়ন বেশ শক্ত। সাবধানে পা ফেলে ও বনির পাশে গিয়ে বসলো। অন্য সবার মতো বনিরও হাত পা বাঁধা। ওর পাশে বসে বিনি আস্তে আস্তে ডাকলো বনি, বনি, ভাইয়া ওঠ।

কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে তাকালো বনি। বিনির মতো সেও প্রথম বুঝতে পারলো না। কোথায় আছে। বললো, আমরা এখন কোথায়?

হালকা ইঞ্জিনের শব্দ বিনি আগেই শুনেছে। বললো, আমার মনে হচ্ছে এটা কোনো জাহাজ হবে।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আমরা যাচ্ছি না। আমাদের নিয়ে যাচ্ছে।

বনি উঠে বসলো। ততক্ষণে অন্য ছেলে মেয়েরাও উঠে বসেছে। বনির চেয়ে ছোট একটা মেয়ে কান্না জুড়ে দিলো। বনি বললো, আপু, এরা কারা?

বিনি বললো, আমাদের মতো ওদেরও গুন্ডারা ধরে এনেছে।

বিনির বয়সী একটা মেয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাড়ি কোথায়?

ঢাকার বনানীতে। বলে পাল্টা প্রশ্ন করলো বিনি–তোমার?

আমাদের বাড়ি চট্টগ্রাম। আমার বাবা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর।

আরো যেসব মেয়ে ছিলো ওরা কাছাকাছি সরে এলো। ওদের কারও বাড়ি ঢাকা, কারো রাজশাহী, কারো খুলনা। ওরা বললো কাকে কীভাবে ধরে এনেছে। ওদের বলার সময় বিনি খেয়াল করলো, সব জায়গাতেই কোনো না কোনো দাড়িওয়ালা শয়তান ছিলো।

সালোয়ার কামিজ পরা তানিয়া বললো, আমি শুনেছি, দাড়িওয়ালা শয়তানটা আমাদের বিক্রি করে দিয়েছে।

বিনি জানতে চাইলো, কাদের কাছে বিক্রি করেছে?

আমাদের যে বাড়িতে রেখেছিলো সেখানে আরবদের মতো পোশাক পরা এক লোক এসে আরবি ভাষায় কী যেন বলাবলি করছিলো।

চুলে পনি টেল বাঁধা নার্গিস বললো, দাড়িওয়ালা একটা বদমাশ আমাকে বলেছে তোর বাবা যেমন আমাদের পেছনে লেগেছে, এবার তার ফল ভোগ করবে।

দরজার বাইরে ঘটাং করে শব্দ হলো। একটু পরে প্যান্ট শার্ট পরা মুখে কালো চাপদাড়ি, চোখে কালো চশমা পরা এক লোক ঘরে ঢুকলো। চারপাশে চোখ বুলিয়ে ফ্যাশফ্যাশে গলায় বললো, বাহ্, সবার ঘুম ভেঙে গেছে দেখি। শোন সবাই, আমি জানি তোমরা সবাই ভালো ছেলে মেয়ে। তোমরা এখন জাহাজে করে মাশকাত যাবে। সবাই যদি কথা দাও ভালো হয়ে থাকবে, তোমাদের হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হবে, ভালো খেতে দেয়া হবে, ভালো ব্যবহার পাবে। আর যদি শয়তানি করো তার উল্টোটা পাবে। এখন বলো কী তোমাদের ইচ্ছা?

বয়সে সবার বড় নার্গিস বললো, আমরা ভালো হয়ে থাকবো।

এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা। একটু পরে তোমাদের হাতের বাঁধন খুলে খাবার দেয়া হবে। পালাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। এখন আমরা আছি ভারত মহাসাগরে। যদি সাগরে ঝাঁপ দাও তীরে ওঠার জন্য তোমাদের অন্তত পক্ষে সত্তর আশি মাইল সাঁতরাতে হবে। অবশ্য এর অনেক আগেই তোমরা হাঙ্গরের পেটে হজম হয়ে যাবে। হা হা হা। লোকটার হাসি শুনে মনে হলো যেন দারুণ একটা মজার কথা বলেছে ও।

তো এই কথা থাকলে তোমাদের সঙ্গে। এই বলে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ওদের সবার চেহারা মলিন হয়ে গেলো অনিশ্চিত গন্তব্যের কথা ভেবে। একটা ছোট মেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

.

০৬.

চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত আবদুল মালেকদের দলের যতগুলো ঘাঁটি ছিলো সবগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বনি বিনির কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না। ঢাকা থেকে আবদুল মালেকও কর্পূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে গেছে। পাহাড়তলীর যে বাড়িতে বনি বিনিকে রাখা হয়েছিলো তাদের প্রতিবেশীদের বর্ণনা থেকে আঞ্জুমনের মুটকি মা আর শুটকো বাপকেও অনেক খোঁজা হলো–কোথাও কারো চিহ্ন মাত্র নেই।

সাত দিন পর চট্টগ্রামের এসপি হাল ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় ডিআইজি সেলিম তরফদারকে জানালেন–ওরা চট্টগ্রামে নেই। হতে পারে অন্য কোনো শহরে, কিংবা দেশের বাইরেও পাচার করে দিতে পারে।

বনি বিনির মা বাবা এবার একেবারেই ভেঙে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার সোনা মানিকদের ওরা মেরে ফেলেনি তো?

ডিআইজি বললেন, আপনাদের এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। শক্ত হোন। আমার মনে হয় না ওদের মেরে ফেলবে। মেরে ওদের লাভ কী? বরং বাঁচিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে বিপদে পড়লে ওদের দিয়ে কোনো ব্যাপারে ওরা দর কষাকষি করতে পারবে। ওদের বাঁচিয়ে রাখলেই লাভ।

বেঁচেই যদি থাকে, পুলিস ওদের খুঁজে পাচ্ছে না কেন?

আমরা গত কদিন শুধু চট্টগ্রামেই খুঁজেছি। এখন অন্য জায়গায়ও খুঁজবো। আপনারা তো জানেন গত দশ দিনে বনি বিনিদের বয়সী নয়টা ছেলে মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে বিভিন্ন শহর থেকে।

বাবা জানতে চাইলেন, তোদের কী ধারণা বনি বিনিকে যারা চুরি করেছে অন্য বাচ্চাদেরও তারাই চুরি করেছে?

শুধু ধারণা নয়, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। বিভিন্ন জায়গায় আবদুল মালেকদের দল যাঁদেরই মনে করেছে ওদের জন্য বিপদজনক, তাদের ওপরই হামলা করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আহমেদ জামালের মেয়েকে ওরা কিডন্যাপ করেছে। কারণ এদের মতো কয়েকজন প্রফেসরের জন্য ওরা এখনও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি কব্জা করতে পারেনি।

ওরা এতটা নীচ! মাসুম বাচ্চাদের ওপর প্রতিহিংসা মেটাচ্ছে, এতটা অমানুষ ওরা?

তুই ওদের কাছে মানবিক কোনো কিছুই আশা করতে পারিস না। ভালো করেই জানিস একাত্তরে ওরা কী করেছিলো। তখন যা পারেনি ওরা এখন তাই করার প্ল্যান করেছে।

আমরা এখন কী করবো?

যা করার আমরা করছি। পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি ছাপা হতে থাকুক।

বনি, বিনি, নার্গিস, তানিয়া সহ নয় জন ছেলে মেয়ের নামে গত ছ দিন ধরে অনেকগুলো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে। পুলিসের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে যাকে যেখান থেকে চুরি করুক না কেন ওদের শেষ দেখা গেছে চট্টগ্রামে। পুলিস খুঁজে না পেলেও বনি বিনির বাবার এটা বদ্ধমূল ধারণা যে, তাদের ছেলেমেয়েরা চট্টগ্রামেই আছে। হয়তো ওদের হিলট্র্যাক্টের কোনো গুহায় আটকে রেখেছে। কিংবা কক্সবাজার বা চট্টগ্রাম শহরের কোনো বাড়ির মাটির নিচের ঘরে! ওরা সব পারে।

টেকো আর কালোকে হাজতে পাঠানো হয়েছে। ওদের অনেক পিটিয়েও জানা যায়নি আবদুল মালেকের সঙ্গে আর কেউ ছিলো কি না, কিংবা পাহাড়তলীর বাড়ির লোকদের চেনে কি না। ওরা পুলিসকে যতটুকু বলেছে তার বেশি ওরা জানতো না। আবদুল মালেকদের দল এদিক থেকে খুব হুঁশিয়ার।

দু দিন পর কী মনে করে ডিআইজি সেলিম টেকো আর কালোকে জামিনে ছেড়ে দিতে বললেন। টেকোরা খুবই অবাক হলো প্রথমে। তারপর ভেবে দেখলো মামলা চলবে, ওরা পালিয়েও যাচ্ছে না, জামিন ওদের পাওয়াই উচিৎ। জেল থেকে বেরোবার আগে ডিআইজি সেলিম নিজে ওঁকে বলেছেন আবদুল মালেকের যদি কোনো খবর পায় তাঁকে যেন সঙ্গে সঙ্গে জানায়, তাহলে পুলিস ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেবে। এ ব্যবস্থা টেকোর খুব পছন্দ হয়েছে। কালোকে বলেছে চোখ কান খোলা রাখতে। ঢাকায় থাকলে আবদুল মালেক বেশিদিন ওদের নজর এড়িয়ে থাকতে পারবে না।

ডিআইজি সেলিম সামান্য প্রমাণের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছেন। আবদুল মালেককে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত তিনি প্রমাণ করতে পারছেন না এটা যে ওদের দলের কাজ। নয়টা বাচ্চা কোথায় কীভাবে আছে এটা জানার জন্যেও আবদুল মালেককে দরকার। অনেক ভেবে চিন্তেই তিনি টেকো আর কালোকে ছেড়েছেন।

টেকোরা জেল থেকে বেরিয়ে আগের জীবনে ফিরে গেছে। আধ ডজন গোয়েন্দা ছদ্মবেশে ওদের ওপর নজর রেখেছিলো। ওদের চোখের সামনে টেকোরা ছোট খাট চুরি চামারি করেই যাচ্ছিলো। ডিআইজি তাঁর গোয়েন্দা বাহিনীকে বলে রেখেছেন এগুলো উপেক্ষা করতে ।

যে নজন ছেলেমেয়েকে জাহাজে করে মাশকাত নেয়া হচ্ছিলো এ কদিনে ওদের ভেতর ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। জাহাজের নিচের তলায় মোটা লোহার জাল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় ওরা চলাফেরার অনুমতি পেয়েছিলো। কারণ নার্গিসের কথা মতো ওরা সবাই ঠিক করেছিলো এদের কথার অবাধ্য হবে না।

জাহাজে ওঠার পর থেকে বনি বিনিরা এদের কাছে থেকে ভালো ব্যবহারই পাচ্ছিলো। এরা শুধু বিরক্ত হয় তখন, যদি কেউ জানতে চায় মাশকাত নিয়ে ওদের কী করা হবে। এক দিন তানিয়া খুব আদুরে গলায় ওদের তদারককারী লোকটাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, চাচু, বলুন না মাশকাত নিয়ে আমাদের কী করবেন?

খোশ মেজাজেই ছিলো লোকটা। তানিয়ার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে বলেছে, মালিক জানেন তোমাদের কী করা হবে। আমরা গোলাম। আমাদের কাজ হচ্ছে হুকুম তামিল করা। এসব কথা আমাকে কক্ষণো জিজ্ঞেস করবে না। আমরা মালিকের গোলামরা নিমকহারামি করতে পারবো না।

বোম্বে, করাচী হয়ে জাহাজ যেদিন মাশকাত পৌঁছবে সেদিন সকাল থেকে বনি বিনিরা উত্তেজিত ছিলো। ভয়ও কম ছিলো না। ভোর বেলা নাশতা খাওয়ার পর ওদের ঘরে সবাইকে নিয়ে মিটিঙে বসলো বিনি। বললো, আমরা এখনো জানতে পারিনি মাশকাত নিয়ে আমাদের কী করবে। তোমাদের নিজেদের কী মনে হয়? ওরা আমাদের নিয়ে কী করতে পারে?

নার্গিস বললো, আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম, ইউরোপ আমেরিকায় যে সব বড় লোকের ছেলে মেয়ে নেই তারা গরিব দেশের ছেলে মেয়েদের নিয়ে যায় পুষবার জন্য।

তানিয়া বললো, ওরা নেয় এতিমখানার বাচ্চাদের, যাদের বাবা মা নেই তাদের।

যারা আমাদের বিক্রি করবে তারা বলবে আমরা এতিম।

তানিয়া একটু ভেবে বললো, হ্যাঁ এরকম হতে পারে। এরকম যদি হয় বিক্রির সময় আমরা কোনো কথা বলবো না। যারা আমাদের কিনবেন তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখবো কেমন লোক তারা। যদি ভালো লোক হয় তাহলে ওঁদের বলবো বাংলাদেশে আমাদের বাবা মা সবাই আছে। এরা আমাদের চুরি করে এনেছে। শুনলে তাঁদের নিশ্চয়ই দয়া হবে।

বনি বললো, ওরা যদি খারাপ লোক হয়?

তাহলে আমরা প্রথমে ওঁদের কাছে ভালো হয়ে থাকবো। যা বলে তাই করবো। সুযোগ মতো পালিয়ে পুলিসকে গিয়ে বলবো। আমরা সবাই ইংরেজিতে কথা বলতে পারি।

নার্গিস বললো, শুনেছি আরবরা বেশির ভাগ অশিক্ষিত। ওরা যদি ইংরেজি না বোঝে?

বিনি বললো, আমি আমাদের হুজুরের কাছে কিছু কিছু আরবি বলা শিখেছি।

তানিয়া উত্তেজিত গলায় বললো, সত্যি বলছো বিনি?

বনি বললো, হ্যাঁ, তানিয়া আপু! বিনি আপু হুজুরের সঙ্গে আরবিতে কথা বলে।

বাহ! বলতো বিনি এ কথাটা আরবিতে কী হবে–আমার নাম তানিয়া?

বিনি লজ্জা পাওয়া গলায় বললো, ইস মী তানিয়া।

আমি বাংলাদেশে থাকি আরবিতে কী হবে?

আনা আসকুনু ফিল বাংলাদেশ।

দারুণ! এবার বলো–আমি বিপদে পড়েছি।

এ কথা আরবিতে কী ভাবে বলবো?

আনা ফি মাশকিলাত।

আমাকে সাহায্য করুন?

উন সুর নী।

আমি একজন ইংরেজি জানা লোক খুঁজছি?

বিনি একটু ভেবে বললো, আনা তালাবতু রাজুলান মাহেরুন ফিল আংকেলিজিয়া।

ব্যস, ব্যস! এতেই হবে। তানিয়া ছুটে এসে বিনিকে জড়িয়ে ধরলো–এর বেশি শেখার দরকার নেই। আমরা সবাই এই কথাগুলো মুখস্ত করে ফেলবো। যে কোনো পুলিসকে এই কথাগুলো বলতে পারলেই আমরা ইংরেজি জানা লোকের খোঁজ পেয়ে যাবো।

বিনি বললো, নার্গিস কথা মতো আমরা কি ধরে নিচ্ছি আমাদের এমন বাপ মাদের কাছে বিক্রি করবে যাদের ছেলে মেয়ে নেই?

তানিয়া চিন্তিত গলায় বললো, না, আমরা তা ধরে নিচ্ছি না। অন্য কিছুও ঘটতে পারে। তোমার কী মনে হয়?

আমি একটা হিন্দি ছবিতে দেখেছিলাম কম বয়সী মেয়েদের বাইজিদের কাছে বিক্রি করে দিতে। বাইজিরা ওদের নাচ গান শিখিয়ে পয়সা রোজগারের জন্য আসর বসায়।

তানিয়া বললো, আরব দেশে বাইজি কোথায়? বাইজি তো সব ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানে!

অন্য দেশেও বাইজি থাকতে পারে।

তা না হয় থাকলো। ছেলেদের নিয়ে বাইজিরা কী করবে? হাত পা ভেঙে ফকির বানিয়ে দিতে পারে।

আমাদের দেশে ছাড়া অন্য কোথাও আজকাল ফকির দেখা যায় না। এ কথাটা তানিয়া ওর বাবার কাছে শুনেছে।

খুলনার রুবেল বললো, বাবা একবার টেলিভিশনে সার্কাস শো দেখে বলেছিলেন, সার্কাসের লোকরা নাকি নানা দেশ থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে চুরি করে ওদের দিয়ে খেলা দেখায়।

তানিয়া মাথা নাড়লো–আমার তা মনে হয় না। সার্কাসের লোকরা চুরি করেই ছেলেমেয়ে জোগাড় করতে পারে, আমাদের পয়সা খরচ করে কিনতে যাবে কেন?

বিনি বললো, আমরা এত কিছু ভাবছি কেন? যাদের কাছেই আমাদের বিক্রি করুক, আমাদের কাজ হবে পালিয়ে আসা। একজনও যদি পালাতে পারি—অন্যদের উদ্ধার করতে পারবো।

নার্গিস বললো, আমাদের যদি এক জায়গায় না রাখে? জানবো কী ভাবে কে কোথায় আছে?

তানিয়া বললো, জাহাজ থেকে নামার পর লক্ষ্য রাখবে আমাদের কোনদিকে নেয়া হচ্ছে। রাস্তার সাইন বোর্ড থেকে যদি নাম পড়তে পারো ভালো। নাহলে যেখানে নিয়ে তুলবে তার চারপাশটা ভালোভাবে খেয়াল করবে। সুযোগ পেলেই পুলিসের সঙ্গে কথা বলবে। যে কোনো ভাবে আমাদের পুলিস স্টেশনে পৌঁছতেই হবে।

দুপুরের দিকে জাহাজ মাশকাত বন্দরে ভিড়লো। এটা ছিলো মাল টানা জাহাজ, কোনো যাত্রী ছিলো না এতে। সরাসরি জেটিতে নোঙ্গর করলো না। বিনিরা পুরু কাঁচ ঢাকা ছোট গোল জানালা দিয়ে দূরে বন্দরে ভেড়া ছোট বড় জাহাজ, উঁচু উঁচু ক্রেন আর লোকজন দেখতে পাচ্ছিলো।

ঘন্টা খানেক পর তদারককারী লোকটা এসে ঘরে ঢুকলো। বললো, তোমরা এখন একটা স্পীড বোটে উঠবে। তোমাদের হাত মুখ কিছুই বাঁধবো না। কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে দুজন করে পাহারাদার থাকবে। ওদের পিস্তলে সাইলেন্সর লাগানো। গুলি করলে এতটুকু শব্দ হবে না। এটুকু বলে লোকটা বড় ছেলে মেয়েদের মুখের দিকে তাকালো। গলাটা এক ধাপ নামিয়ে বললো, তোমাদের কারো কারো মাথায় পালাবার চিন্তা থাকতে পারে। আমি তোমাদের শুধু এটুকু বলবো, বেঁচে থাকাটা এখনকার জন্য বেশি জরুরী। শেখের লোকদের প্রাণে দয়ামায়া কিছু নেই। বেতাল দেখলেই জানে মেরে ফেলবে। যদি প্রাণে বেঁচে থাকো পরে পালাবার সুযোগ পেতেও পারো। এখন কোনো রকম সুযোগই নেই। এই বন্দরের পুলিসরাও শেখের পোষা চাকর।

লোকটা চলে যাবার একটু পরই আরবদের পোশাক পরা দুজন লোক ঘরে ঢুকলো। ওদের চোখে কালো চশমা, থুতনিতে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, কর্কশ গলায় বাংলায় বললো, সবাই এক এক করে স্পিড বোটে ওঠো। হাঙ্গর আর পিয়ানহার খাবার হতে না চাইলে চুপচাপ বোটে বসে থাকবে।

বিনি এগিয়ে এসে বনির হাত ধারলো। ছোট ভাইটাকে ও কোনো অবস্থায় হারাতে চায় না। কালো চশমার কথায় বনি খুব ঘাবড়ে গেছে। ও নিজেও শক্ত করে বিনির হাত আঁকড়ে ধরলো।

স্পিড বোট নটা ছেলে মেয়েকে নিয়ে বন্দরের উত্তর দিকে একটু ফাঁকা জায়গায় ভিড়লো। ওদের পাহারা দেয়ার জন্য ন জন লোক দাঁড়িয়েছিলো বোটের দুই কিনারে।

মাশকাত বন্দরের মাটিতে পা রাখতেই বিনির বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো। কোথায় বাংলাদেশ আর কোথায় মাশকাত! ওর চোখ দুটো কান্নায় ভিজে এলো। যে লোকটা ওর পাশে পাশে হাঁটছিলো বিনির চোখের পানি দেখে ও চাপা গলায় বললো, খবরদার কান্নাকাটি করবে না। হাতে ছুরি আছে। এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবো।

বিনি চোখ মুছে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলো। বন্দরের জেটি পেরোতেই সাদা দাড়িওয়ালা এক বাঙালি এসে কালো চশমাকে নিচু গলায় বললো, ছেলে আলাদা, মেয়ে আলাদা।

কালো চশমা বিনির হাত থেকে বনিকে টেনে নিতেই ও বললো, না, বনি আমার কাছে থাকবে। বনিও বিনির দিকে এক হাত বাড়িয়ে কান্না ভেজা গলায় বললো, আপু, আমাকে ফেলে যাস না। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো বনি।

সঙ্গে সঙ্গে বিনি আর বনির পাঁজরে দুজন আরব এসে ছুরি ঠেকালো। কালো চশমা বললো, আর একটা কথা বললে এখানেই শেষ করে ফেলবো।

বিনি আর বনি কোনও কথা বললো না। বনি বার বার ঘুরে ঘুরে বিনিকে দেখছিলো। কালো টুপি পরা একটা লোক কালো চশমাকে বললো, এই গাড়ি।

বিনিকে ঠেলে মস্ত বড় মার্সেডিজ-এর পেছনের সিটে তুললো। ওরা দুজন ওর পাশে বসলো। গাড়ির যে ড্রাইভার সেও কালো চশমা পরা। কালো টুপি ওকে বললো, হুজুরের মহলে চলো।

বনিকে হারিয়ে বিনির বাবা মার কথা মনে হলো। ওরা যত বারণ করুক কিছুতেই ও কান্না সামলাতে পারলো না। বনি, ভাইয়া! বলে আর্ত চিৎকার করে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো বিনি।

গাড়ি তখন প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলো শহরতলীর দিকে।

৭-৮. টেকো আর কালো গুণ্ডা

টেকো আর কালো গুণ্ডাকে ছেড়ে দিয়ে ডিআইজি সেলিম তরফদার যে ভুল করেননি এটা তিনি তখন উপলব্ধি করলেন, যখন বনি বিনিকে ফিরে পাওয়ার আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। ওদের বাবা মা অবশ্য বনি বিনির হারিয়ে যাওয়ার এক মাস পরও হাল ছাড়েননি। বাবা এর ভেতর দুবার চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। প্রত্যেকটা পাড়ায় দুবার, তিনবার করে ঘুরেছেন এই আশায় যদি কোথাও ছেলে মেয়ে দুটো ওঁর নজরে পড়ে। বায়েজিদ বোস্তামির মাজারে গিয়ে ভিখিরিদের দঙ্গলের ভেতরও ওদের খুঁজেছেন তিনি। রেল স্টেশন আর বন্দরে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকেছেন। ওদের ছবি হাতে নিয়ে একবার কক্সবাজার পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

বনি বিনির মা কখনো পীর ফকিরের কেরামতি বিশ্বাস করতেন না। পাড়ার মহিলারা এসে তাকে যখন বললেন, নয়াটোলার হুজুর আয়না পড়া জানেন। আয়না দেখে তিনি বলে দিতে পারবেন বনি বিনি কোথায় গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে মা ছুটলেন নয়াটোলার হুজুরের কাছে।

হুজুর কালি মাখা একটা আয়নায় কী দেখলেন তিনিই জানেন। বললেন, দুটো গরু জবাই করে সদকা দে বেটি । তোর ছেলেমেয়েদের খুব বিপদ!

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ওরা কোথায় আছে, কিসের বিপদ, দয়া করে বলুন।

হুজুর তখন ধ্যানে বসে গেছেন। মুরিদরা বললো, হুজুর এখন কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। আপনি সদকা দিন। তিনি বাচ্চাদের জন্য দোয়া খায়ের করবেন।

পরদিন মা গাবতলিতে লোক পাঠিয়ে দুটো গরু কিনে এনে দরবারে দিয়ে এসেছেন। হুজুর একবার বলেন, ওরা একটা বন্ধ ঘরে আছে। একবার বলেন, ওরা ঘুমোচ্ছে। আবার বলেন, ওরা মা মা বলে কাঁদছে। এর বেশি কিছু বলেননি তিনি।

আরেক দিন এক প্রতিবেশী খবর আনলেন, মোহম্মদপুরে এক জিন্দা পীর এসেছেন বিহার শরীফ থেকে। তাঁর নাকি দুটো পোষা জ্বীন আছে। জ্বীনরা সব খবর এনে দিতে পারে।

প্রতিবেশী মহিলাকে নিয়ে মা তখনই ছুটলেন জ্বীন পোষা হুজুরের কাছে। সেই হুজুরও ঘাবড়াও মৎ! লাড়কি, লাড়কা জরুর মিলেগা, বলে ধ্যানে বসলেন।

মা বার বার কব মিলেগা, কঁহা মিলেগা, বলে কোনো উত্তর পেলেন না।

অমল কাকুরা মাত্র দুসপ্তাহের ছুটিতে এসেছিলেন। ছুটি ফুরোতেই ওঁরা কলকাতা ফিরে গেছেন। যাবার আগে রিনা কাকী আর মা গলা জড়াজড়ি করে সে কী কান্না! পঁয়ত্রিশ দিন পর ডিআইজি সেলিম বনি বিনিদের বাড়িতে এসে বাবা মাকে বললেন, আবদুল মালেকের সন্ধান পেয়েছি।

বাবা সেদিনই তৃতীয়বারের মতো চট্টগ্রাম থেকে ফিরেছেন। তাঁর গাল ভেঙে গেছে, চোখে অনেক দিন না ঘুমোনোর ক্লান্তি, চুল উসকো খুসকো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ের শার্টে ক্রিজ নেই–সেলিম তরফদারের কথা শুনে উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন–কোথায়?

উত্তেজিত হোস নে। টেকো গুণ্ডা খবর এনেছে। ও কলুটোলা মসজিদে ইমামতি করতে দেখেছে আবদুল মালেককে।

অ্যারেস্ট করেছিস?

না। খবর পেলাম সন্ধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে থানার ওসিকে আর ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চকে বলেছি কী করতে হবে।

বাবা অসহিষ্ণু গলায় বললেন, প্লীজ সেলিম, ওকে অ্যারেস্ট কর! ও ঠিক বলতে পারবে আমাদের বনি বিনি কোথায়!

ডিআইজি সেলিম গম্ভীর হয়ে বললেন, ওকে দুদিন পর অ্যারেস্ট করা হবে। ওর গতিবিধির ওপরে নজর রাখা দরকার। কোথায় যায়, কার কাছে যায়, ওর কাছে কারা আসে এসব আগে জানা দরকার।

যদি ও পালিয়ে যায়?

আমার ওপর এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারিস। এবার ও আমার হাত থেকে পালাতে। পারবে না।

আমার বিনি, আমার বনি, বলে মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

দুদিন অপেক্ষা করেও গোয়েন্দারা আবদুল মালেক সম্পর্কে তেমন কোনো খবর দিতে পারলো না। লোকটা সারাদিনই মসজিদের পাশে ইমামের ঘরে থাকে। একটা ফুটফুটে চেহারার ছোকরা চাকর আছে। রান্না বান্না থেকে যাবতীয় ফুট ফরমাশের কাজ সেই করে। রাতে আবদুল মালেকের কামরায় ঘুমোয়। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মানুষের সঙ্গে গত দুদিনে ওর যোগাযোগ হয়নি।

সেলিম তরফদার বললেন, ছোকরা যখন বাজার করতে যাবে তখন ওকে গ্রেফতার করার জন্য। দারোগা তাই করলেন। ছোকরাকে জেরা করে জানা গেলো, এই নতুন ইমাম এসেছে মাত্র পঁচিশ দিন আগে। বাইরে খুব কমই যায়। তবে গেলে কখনো গোটা রাতই বাইরে কাটায়। ফজরের ঠিক আগে ফিরে আসে। ইমামের কাছে কেউ আসে না। এমনিতে ইমাম লোক ভালো। ওকে অনেক আদর করে।

আগের ইমামটা নাকি খুব খারাপ ছিলো। ছোকরাটা বছর দুয়েক ধরে এ মসজিদে ইমামের কাজের লোক হিসেবে আছে। মসজিদ কমিটি ওকে বেতন দেয়।

এরপরই গ্রেফতার করা হলো আবদুল মালেককে। প্রথমে ও কিছুই স্বীকার করেনি। আল্লাহর কসম বলে কোরাণ শরীফ ছুঁয়ে সে বলেছে জীবনেও সে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলো না। বনি বিনি নামের কাউকেই সে চেনে না। টেকো কালো গুণ্ডাকেও চেনে না। থানায় জেরা করার সময় নিয়ম মাফিক যে সব মার দেয়া হয় তাতেও ওর কিছু হয়নি। প্রথমে যা বলেছে, অনেক মারার পরও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

শেষে টেকো আর কালোকে ওর সামনে হাজির করতেই পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেলো। দারোগা প্রথমে মোলায়েম গলায়ই বলেছিলেন, আবদুল মালেক সাহেব, দেখুন তো এই দুজন লোককে চেনেন কি না?

এক ঝলকের জন্য টেকো কালোকে দেখে মাথা নিচু করে আবদুল মালেক বলেছে, না, ওদের চিনি না।

এ রকম জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা শুনে টেকোর চোখ কপালে উঠলো। কালোকে বললো, আবে কাউলা, হুজুর হালায় কয় কী? আমগোরে বলে চিনে না? অই হুজুর, গত মাসে ক্যাঠায় আমাগো তিরিস হাজার টাকা দিছে? ক্যাঠায় কইছে বনি বিনিরে ম্যালার থনে উঠায়া টেরেনে কইরা পাহাড়তলী দিয়া আইতে?

মিথ্যা কথা! ঘাড় মোটা করে বললো আবদুল মালেক।

টেকো গুণ্ডা এবার রেগে গেলো। একটা কুৎসিৎ গালি দিয়ে বললো, শরম করে না, দাড়ি রাইখা মিছা কতা কইতে! আবার বলে মজ্জিদে ইমামতিও করে! আমার লগে বেসি তেরিবেরি করবা না। সিদা সিদা কও কলতা বাজারে আমার ঘরে গিয়া তিরিস হাজার ট্যাকা দিয়া আহ নাই? মোড়ের ইসকান্দর পানঅলারে তুমি আমার নাম ঠিকানা জিগাও নাই?

এরপর টেকো থানার দারোগাকে বললো, স্যার এমনে ওইবো না। দস নম্বরি দসটা নখের ভিতরে হান্দায়া দ্যান। দ্যাখেন, বাপ বাপ কইরা কবুল করবো।

দশ নম্বর সূচ মাত্র আনা হয়েছে–নখে ঢোকাবার আগেই মুখ খুললো আবদুল মালেক। গড় গড় করে পুরো ইতিহাস বলে গেলো রোবটের মতো।

একাত্তরে ও আলবদর ছিলো ঠিকই এবং বাহাত্তরে গ্রেফতারও হয়েছিলো। জেল থেকে বেরিয়ে আর পার্টি করেনি, ছোট খাট ব্যবসা নিয়ে ছিলো। বছর দুই আগে ওকে খবর দেয়া হলো একাত্তরের আল

বদর বাহিনী আবার গঠন করা হচ্ছে। পুরোনোদের ভালো বেতন দেয়া হবে। কয়েক বছর ধরে ওর ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছিলো। তাই নতুন করে আবার নাম লিখিয়েছে আল বদরে। এবারের সংগঠন পুরোপুরি গোপন। কারা আছে কিছুই সে জানে না। তার সঙ্গে একজন মাত্র যোগাযোগ রাখে। কী করতে হবে বলে। মাসের পয়লা তারিখে বেতনের টাকাটা হাতে ধরিয়ে দেয়।

দলের নির্দেশেই আবদুল মালেক বনি বিনিকে চুরি করেছে। ওর কাজ ছিলো ওদের পাহাড়তলী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। টেকো আর কালোকে এ জন্য সে ভাড়া করেছিলো। ওদের দলের নেতারা আরব দেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পাঠানোর ব্যবসা করে। বেশি ছোটদের উটের দৌড়ে ব্যবহার করা হয়। একটু বড়রা শেখদের বাড়িতে নফর আর বাদী হিসেবে থাকে। বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের বাদীদের খুব চাহিদা আছে আরব শেখদের বাড়িতে। মেয়ে হিন্দু, খৃস্টান হলেও ক্ষতি নেই, তবে ছেলেদের অবশ্যই মুসলমান হতে হবে।

শেষ চালান মাশকাত যাওয়ার কথা। মাশকাতে আবার ভদ্রলোকদের ছেলে মেয়েদের চাহিদা বেশি। ওরা সবাই যে মাশকাত থাকবে তা নয়। ওখানে অন্য সব আরব দেশের শেখরাও ছেলে মেয়ে কিনতে আসে।

আবদুল মালেক যতটুকু তথ্য দিয়েছে তার ভিত্তিতে সেলিম তরফদার প্রথমে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের পুলিস ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এক থেকে দেড় মাস আগে ইন্ডিয়া থেকে একশ আশি জন ছেলে মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে, আর পাকিস্তান থেকে পঁয়ত্রিশ জন। এদের বয়স তিন থেকে বারোর মধ্যে। এরা সবাই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়ে, এদের চেহারাও সুন্দর। ডিআইজি সেলিম তাঁর আশঙ্কার কথা জানালেন ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের পুলিস ডিপার্টমেন্টকে। সবাই মিলে ঠিক করলেন তারা এ ব্যাপারে ইন্টারপোলের সাহায্য নেবেন। আরো ঠিক করলেন প্রত্যেকে তাঁদের একজন তুখোড় গোয়েন্দাকে গোপনে মাশকাত পাঠাবেন। মাশকাতে তিন দেশের দূতাবাসকেও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলবেন।

আরব শেখরা উটের দৌড়ে বাচ্চাদের ব্যবহার করে–এ খবর পশ্চিমের সাংবাদিকরা এর আগেই জেনেছিলো। ইউরোপ আমেরিকায় বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার সংগঠন রয়েছে, যাদের কাজ হচ্ছে এ ধরনের অমানবিক ঘটনার প্রতিকার করা। পশুদের কষ্ট দূর করার জন্যও পশ্চিমে অনেক সংগঠন আছে। আর মানুষের বাচ্চাদের এরকম অমানুষিকভাবে খুন করা হবে, এটা ওদের ধারণার বাইরে।

গরিব দেশগুলোর বিপদ হচ্ছে তাদের অনেকে আরব দেশের টাকার ভরসায় বাজেট করে। সে জন্য ওরা শেখদের এসব অত্যাচারের কথা জেনেও না জানার ভান করে।

বিনিদের যে শেখের বাড়িতে আনা হয়েছিলো রেস খেলার জন্য ওর দশটা উট আছে। শহরের পশ্চিম সীমানায় বিশাল প্রাসাদ ওর। শিকারী বাজ পাখি আছে ডজন খানেক, তেজী ঘোড়া আছে পনেরোটা আর বিয়ে করা বিবি চৌদ্দটা। চৌদ্দ বিবি থাকে প্রাসাদের চোদ্দ মহলে, ওদের বাদী আর খেদমতগারের কোনো হিসেব নেই। শেখের বড় বিবির ছেলে মেয়ে নেই, তাই ও বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের চারটা ছেলে মেয়ে পুষ্যি নেবে ঠিক করেছিলো। মালয়েশিয়ারটা আগেই জোগাড় হয়ে গিয়েছিলো। নতুন চালানে বাকি তিন দেশের তিনটা এসেছে। ওরা সবাই একই জাহাজে মাশকাত এলেও আলাদা জায়গায় রাখা হয়েছিলো বলে আগে পরিচয় হয়নি।

বিনির সঙ্গে মালয়েশিয়ার ফাতিমা, ইন্ডিয়ার আফজাল আর পাকিস্তানের দিবার পরিচয় হয়েছে শেখের বাড়িতে বড় বিবির এক নম্বর মহলে। বড় বিবির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে ওদের রাখা হয়েছিলো মহলের একটা ছোট কামরায়। ফাতিমা এসেছে দুদিন আগে। ওকেই বিনি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, ওদের এখানে কেন আনা হয়েছে ও কিছু জানে কি না।

ফাতিমা বয়সে বিনির বছর দুয়েকের বড় হবে। বললো, শুনেছি শেখের বড় বিবির বাদী বানাবে আমাদের।

তুমি দেখেছো বড় বিবিকে?

না, আজ সন্ধ্যায় দেখা হবে।

এখানকার লোক জনের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে? ওরা কেমন?

আমাকে এক বয়স্ক মহিলা খাবার দিয়ে যায়। খুবই বদমেজাজী। সারাক্ষণ সবাইকে গালাগালি করে। আমার সঙ্গেও সব সময় ধমক দিয়ে কথা বলে।

মহিলা কোন দেশের?

সম্ভবত পাকিস্তানের। ইন্ডিয়ারও হতে পারে। আরবি ছাড়া উর্দু বলতে পারে।

তুমি আরবি বলতে পারো?

হ্যাঁ পারি? তুমি?

আমিও কিছু কিছু পারি।

আফজাল আর দিবা উর্দু আর ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না। বিনি ওদের শিখিয়ে দিলো বিপদে কাজ চালাবার মতো কয়েকটা আরবি কথা। জাহাজে তানিয়াদের সঙ্গে পালাবার যে পরিকল্পনা করেছিলো ফাতিমাদের সব খুলে বললো। ফাতিমা বললো, তুমি ভালো বুদ্ধি বের করেছে। যেভাবেই হোক আমাদের এখান থেকে পালাতেই হবে।

তার আগে কয়েকদিন এদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে জানতে হবে আমাদের সঙ্গে অন্য যারা এসেছে ওদের কোথায় রাখা হয়েছে।

বিনির কথা শুনে দশ বছরের আফজাল ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বিনি জিজ্ঞেস করলো, কাঁদছো কেন আফজাল, কী হয়েছে?

কাঁদতে কাঁদতে আফজাল বললো, আমার সঙ্গে ওরা আমার চার বছরের ছোট বোন সীমাকেও ধরে এনেছে। বন্দরে ওকে যখন আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো ও খুব কাঁদছিলো।

আফজালের পিঠে হাত রেখে বিনি বললো, ভাইয়া কেঁদো না। ওরা আমার ছোট ভাই বনিকেও আমার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ওদের উদ্ধার না করে আমরা দেশে ফিরে যাবো না।

আফজাল আর বিনির কথা শুনে ফাতিমা দিবার চোখেও পানি এসে গেলো। দিবা বললো, বাড়িতে আমার একটা ছোট বোন আছে। আমাদের মা নেই। ছোট বোনটা আমাকে ছাড়া এক মিনিটও থাকতে চায় না।

ফাতিমা বললো, আমরা যদি এখান থেকে পালাতে না পারি বিষ খেয়ে মরবো।

ম্লান হেসে দিবা বললো, এখানে কে তোমাকে বিষ দেবে?

আমার সঙ্গে আছে। গলায় ঝোলানো লকেটটা দেখিয়ে ফাতিমা বললো, আমাদের বংশের নিয়ম মেয়েরা বড় হলে সব সময় বিষ রাখে সঙ্গে। বিপদে পড়লে ইজ্জত বাঁচাবার জন্য ওরা বিষ খেয়ে মরে।

বিনি বললো, আমরা মরবো না ফাতিমা। আমরা ওদের মারবো। বিষটুকু সাবধানে রাখো। এ নিয়ে আর কিছু বোলো না। মনে রাখবে আমরা শত্রু পুরিতে আছি।

.

০৮.

শেখ আবদুল খালেক বিন মোত্তালেবের বড় বিড়ি জোহরা খাতুন সন্ধ্যেবেলা নিজের খাস মহলে বসে তখন ভিসিআরে হিন্দি ছবি দেখছিলো। ছবি হিন্দি হলেও আরবি সাব টাইটেল ছিলো। নতুন চারটা ছেলে মেয়েকে তার কাছে সামনে হাজির করে বলা হলো এই চালানের সেরা মাল এগুলো।

তীক্ষ্ণ চোখে আপাদমস্তক ওদের দেখে জোহরা খাতুন বললে, খালি চেহারা সুরত ভালো হলে তো চলবে না, আদব কায়দা জানে কি না সেসব দেখতে হবে।

বাঁদী নুসরাত বললো, এরা সবাই ভালো খানদানের ছেলে মেয়ে।

এ্যাই তোদের নাম কী? তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জানতে চাইলো জোহরা খাতুন।

ওরা সবাই নাম বললো। বিনি আর দিবা নাম দুটো জোহরা খাতুনের পছন্দ হলো না। বললো, এসব নাসারা নাম আমি শুনতে চাই না। বিনির দিকে আঙুল তুলে বললো, তোর নাম খোদেজা। তারপর দিবাকে দেখিয়ে বললো, তোর নাম জোলেখা। ঠিক আছে?

বিনি আর দিবা মাথা নেড়ে সায় জানালো। বাঁদী নুসরাতের দিকে তাকিয়ে জোহরা খাতুন বললো, এগুলোকে এখন নিয়ে যা। আরবি শেখানোর ব্যবস্থা কর। আর গান্ধা পোশাক পরে আমার সামনে যেন না আসে।

তাই হবে বিবি সাহিবান! বলে নুসরাত ওদের চারজনকে জোহরা খাতুনের খাস মহল থেকে বের করে নিয়ে গেলো।

ওদের চারজনের জন্য একটা কামরা দেয়া হয়েছে। নুসরাত বললো, তোমাদের পুরোপুরি তৈরি করা হলে প্রত্যেককে আলাদা কামরা দেয়া হবে।

কী ভাবে আমাদের তৈরি করা হবে? জানতে চাইলো দিবা। নুসরাত ওদের সঙ্গে উর্দুতে কথা বলছিলো।

প্রথমে ভাষা শেখানো হবে। তারপর বিবিজির যত্ন কেমন করে নিতে হবে, কী ভাবে বিবিজির মন ভালো করা যাবে, সে সব আস্তে আস্তে শেখানো হবে।

আমরা কি বিবিজির বাঁদী?

ঠিক বাঁদী নও। কারণ তোমাদের কাজ করার জন্য লোক থাকবে। তবে বিবিজির কাছে তোমরা বাদীর মতোই। তিনি যা হুকুম করবেন তোমাদের মুখ বুজে তামিল করতে হবে। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো নুসরাত। কী মনে করে আবার ঘুরে দাঁড়ালো। বললো, সব সময় মনে রাখবে তোমরা হলে বড় বিবিজির বড় মহলের বাসিন্দা। অন্য মহলের বাসিন্দারা আমাদের হিংসা করে। ওদের সঙ্গে কক্ষণো কথা বলবে না। বড় বিবিজি জানতে পারলে জানে মেরে ফেলবেন।

নুসরাত চলে যাওয়ার পর ফাতিমা বললো, আগের মহিলার চেয়ে নুসরাতকে ভালো মনে হচ্ছে। তবে সমস্যা হচ্ছে ও বিবির খুব বাধ্য।

বিনি বললো, দুতিন দিন যাক। তারপর দেখ না নুসরাত বিবিকেও পটিয়ে ফেলবো।

ওর কথা শুনে সামান্য হেসে দিবা বললো, বড় বিবির চেহারা দেখেই ঘেন্না হচ্ছে আমার। যেন একতাল পচা মাংসের পিণ্ড। ওর থাকা উচিৎ ছিলো ডাস্টবিনে!

আফজাল বললো, আমি ওর কাছে ছিলাম। তোমরা টের পাওনি। কথা বলার সময় ভক ভক করে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিলো ওর মুখ দিয়ে।

দিবা ফোড়ন কাটলো-বদমাশটা বলে কি না আমরা গান্ধা!

বিনি বললো, নুসরাত যাওয়ার সময় যে কথাটা বলে গেলো এ নিয়ে কিছু ভেবেছো?

কোন কথা? অন্য মহলের লোকরা এ মহলের লোকদের হিংসা করে।

হ্যাঁ!

হিংসা তো করতেই পারে। দিবা বললো, আমাদের ভারি দায় পড়েছে অন্য মহলের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে!

বিনি গম্ভীর হয়ে বললো, আমি ঠিক এর উল্টোটা বলতে চাই।

ফাতিমা একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললো, কী বলবে খুলে বলো না!

শোন সবাই। অন্য মহলের লোকরা বড় বিবিকে পছন্দ করে না। আমরাও করি না। আমাদের এই পছন্দের কথাটা ওদের কোনো ভাবে জানাতে হবে। ওরা যদি বড় বিবিকে। জব্দ করতে চায় আমাদের পালাবার সুযোগ করে দিক। অন্য মহলে আমাদের বয়সী যদি কাউকে দেখো, ভাব জমাবার চেষ্টা করো। আমার ধারণা এতে কাজ হবে।

ফাতিমা ওকে সমর্থন করলো বিনি, ঠিকই বলেছো। নুসরাতকে দিয়ে কাজ হবে না। আমাদের অন্য মহলের বাসিন্দাদের সাহায্য নিতে হবে। দেখতে হবে বড় বিবির ওপর কার রাগ বেশি।

আফজাল বললো, অন্য মহলে সেরকম যদি বন্ধু খুঁজে পেলে সীমা বনিদের খবরও ওরা এনে দিতে পারে।

বিনি বললো, সীমা বনির খবর না নিয়ে আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি না।

বনিদের রাখা হয়েছিলো শেখ আবদুল খালেক বিন মোত্তালেবের বড় ভাই শেখ আবদুল জালাল বিন মোত্তালেবের প্রাসাদে। শেখ জালালের প্রাসাদ এর চেয়েও বড়। তার বিবির সংখ্যা ষোল, রেসের উট পঁচিশটা, বাজ পাখি একুশটা আর ঘোড়া পঞ্চাশটা। ষোল বিবির ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেয়াল্লিশটা, যাদের ভেতর ছেলের সংখ্যাই বেশি।

দুই প্রাসাদের ছেলেমেয়ের চাকর নফরদের মধ্যে যাতায়াত থাকলেও রেষারেষিও কম ছিলো না। আবদুল মালেকদের দল দুই শেখকেই তোয়াজ করে পয়সা আদায় করে। ওদের দলের নেতারা গিয়ে বলে, শেখরা দয়া না করলে বাংলাদেশের গরিব মুসলমানরা না খেয়ে মরে যাবে, গির্জার পাদ্রী আর এনজিওরা ওদের খৃস্টান বানিয়ে ফেলবে–এমনি সব বানানো কথা! এক শেখ বলে, আমাদের কোরবানির উট আর দুম্বার গোশত পাইয়ে দেবো তোমাদের। আরেক শেখ বলে, ভালো ভালো বাচ্চা পাঠাও আমাদের রেসের জন্য। তোমাদের পার্টি চালাবার পুরো খরচ আমরা দেবো।

আগের চালানের দুটো ছেলে কোন ফাঁকে প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো, সেজন্য শেখ জালালের প্রহরীরা বনিদের হাত বেঁধে দিয়েছে। বনিকে যে ঘরে রাখা হয়েছে সেখানে আরো সাতজন ছেলে ছিলো। দুজন ওর বয়সী, অন্যরা চার থেকে ছয় বছরের। পাকিস্তানী ছেলে ইমরান এখানে আসার পর থেকে সামনে কাঁদছে। বেচারা উর্দু ছাড়া কিছু বলতে পারে না, বনি উর্দু বুঝলেও বলতে পারে না। ও ছাড়া অন্য ছেলেরা উর্দু বলতে পারে। ওরা সবাই ছিলো ইন্ডিয়ান।

এখানে এসে বনিরও প্রথম দিকে খুব মন খারাপ ছিলো বিনির জন্য। প্রথমে কারো সঙ্গে কথা বলেনি। ওর অল্প বড় ইন্ডিয়ার আসলাম ভালো ইংরেজি বলতে পারে । আসলামই ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, মেয়েদের মতো কান্নাকাটি করলে চলবে না। এখান থেকে কী ভাবে পালানো যায় এসো সেই প্ল্যান করি।

জাহাজে বসে বিনি যেভাবে পালাবার কথা বলেছিলো বনি সেটা আসলামদের বললো। আসলাম বললো, হ্যাঁ এটা খুব ভালো আইডিয়া। এসো, আমরা সবাই মিলে আবার কথাগুলো মুখস্ত করে ফেলি। আমি আমার নাম দেশের কথা বলবো, এভাবেইস মী আসলাম। আনা আসকুন ফিল ইন্ডিয়া। বনি, ওরা আরবিতে ইন্ডিয়াকে অন্য কিছু বলে নাতো?

জানি না। ইন্ডিয়া বললেও বুঝবে। ইমরান তুমি বলতে কীভাবে বলবে?

ইমরান প্রথমে বলতে পারলো না। কয়েক বার বলার পর সেও শিখে নিলো–ইস মী ইমরান। আনা আসকুন ফিল পাকিস্তান।

অন্য যারা ছিলো ওরাও বনির শেখানো আরবি কথাগুলো মুখস্ত করে ফেললো। বনি বললো, আমরা যে এসব কথা জানি শেখদের লোকরা যেন টের না পায়।

বনির কথা শেষ না হতেই দরজা খোলার শব্দ হলো। আরবদের পোশাক পরা দুই পাকিস্তানী এসে ঘরে ঢুকলো। চেহারা দেখে বনিরা অবশ্য আরবই ভেবেছিলো। ওরা যখন পশতু টানে উর্দু বললো তখন

আসলাম বুঝে ফেললো ওরা পাকিস্তানী । ওদের একজনের মুখ চ্যাপটা আরেকজনের মুখ লম্বা। দুজনের চোখেই কালো চশমা।

চ্যাপটা মুখ কফ মেশানো ঘড়ঘড়ে গলায় জানতে চাইলো, এখানে তোমাদের ভেতর পাকিস্তানের কোনো ছেলে আছে?

ইমরান ওদের দেখেই ভয়ে ফোঁপাচ্ছিলো। আসলাম ওকে দেখিয়ে বললো, ওর নাম ইমরান। ও পাকিস্তানী।

ইমরান পাকিস্তানী শুনে লম্বমুখোর মায়া হলো। ইমরানের পাশে বসে আদর করে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, তুমি কাঁদছো কেন ইমরান। পাকিস্তানী ছেলেরা খুব বাহাদুর হয়। হিন্দুস্তানীদের মতো বুজদিল নয়।

লম্বামুখোর কথা শুনে আসলামের খুব রাগ হলেও মুখে কিছু বললো না। ইমরান ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, আমি আমার আব্দু আম্মির কাছে যাবো।

লম্বামুখো উঠে চ্যাপটামুখের কাছে গিযে চাপা গলায় বললো, একে শেখ বশীরের বাড়ি থেকে বদলে আনা যায় না? এখানে থাকলে শিগগিরই মারা পড়বে।

দু এক দিন যেতে দাও। চেষ্টা করলে হয়তো পারা যাবে। চিন্তিত গলায় চ্যাপটামুখো বললো, শেখ জালাল যদি টের পায়, আমাদের তলোয়ার দিয়ে এক কোপে দু টুকরো করে ফেলবে।

আসলাম লম্বমুখোকে বললো, চাচা, আমাদের কি শিগগিরই মেরে ফেলা হবে?

লম্বমুখো চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, তোরা নোংরা হিন্দুস্তানী! তোদের যদি এক্ষুণি মেরে ফেলতো, আমি খুশি হতাম।

বনিকে দেখিয়ে আসলাম বললো, ও হিন্দুস্তানের নয়, বাংলাদেশের।

আগের মতো চিবিয়ে চিবিয়ে লম্বমুখো বললো, হিন্দুস্তান আর বাংলাদেশ দুটোই আমার কাছে এক! পাকিস্তান ভেঙেই তো বাংলাদেশ বানিয়েছে হিন্দুস্তান।

চ্যাপটামুখো তার সঙ্গীকে বললো, চলো, মিটিঙে দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের চামচারা এসেছে শেখ জালালের টাকা খসাবার জন্য।

আগের মতো দরজা বন্ধ করে চলে গেলো চ্যাপটামুখো আর লম্বমুখো দুই পাকিস্তানী। ওরা বেরিয়ে যেতেই দাঁতে দাঁতে চেপে আসলাম বললো, শয়তান! যদি হাতটা ভোলা থাকতো তাহলে বুজদিল বলার মজা টের পাইয়ে দিতাম।

বনি বললো, রাতে খাবার সময় ওরা নিশ্চয় হাত খুলে দেবে। তখন বলবো আর যেন হাত না বাঁধে।
আসলাম বললো, এ কথাটা ইমরান বললে ভালো হয়। ও পাকিস্তানী শুনে ওদের প্রাণে ওর জন্য দয়া হয়েছে। কী ইমরান, বলতে পারবে না ভাইয়া?
ইমরান মাথা নেড়ে সায় জানালো–হ্যাঁ, পারবো।
রাতে লম্বমুখোই ওদের খাবার নিয়ে এলো। রুটি আর দুম্বার কাবাব। সবার আগে ও ইমরানের হাত খুলে দিলো। তারপর অন্য সবার হাত খুলে বললো, ঝটপট খেয়ে নাও। আমার অন্য কাজ আছে।
ওদের সবারই খুব খিদে পেয়েছিলো। পেট ভরে ওরা রুটি কাবাব খেলো। যদিও এরকম শক্ত রুটি বনি ওদের বাড়িতে থাকলে ছুঁয়েও দেখতো না। এমনকি ছোট ইমরানও দুটো রুটি খেলো।
খাওয়া শেষ করার পর লম্বামুখো যখন আগের মতো দড়ি দিয়ে ওদের হাত বাঁধতে যাবে ইমরান কেঁদে ফেললো–চাচা, আপনার আল্লার কসম! আমাদের এভাবে বাঁধবেন না। আমাদের খুব তকলিফ হয়।
লম্বামুখো একটু ভেবে বললো, ঠিক আছে, তুমি সবার ছোট, তোমারটা আমি বাঁধবো না। অন্য সবাই খুব পাজী আছে। ওদের হাত বাঁধবো। এই বলে প্রথমেই ও আসলামের হাত বাধলো।
ইমরান বললো, এরা সবাই খুব ভালো চাচা। আমাকে ওরা খুব আদর করে।
ওর কথায় কোনও কাজ হলো না। লম্বামুখো বাকি সবার হাত শক্ত করে বেঁধে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে বললো, চুপচাপ ঘুমাবে। কোনো রকম শয়তানি করলে পাশে আমাদের জুলুমখানা আছে! ওখানে ঢুকিয়ে দিলে জীবনে আর ভুলেও বেচাল হবে না।

৯-১০. বড় বিবির মহলে

বড় বিবির মহলে দুটো দিন বৃথাই গেলো বিনিদের। সকাল সন্ধ্যা দুবেলা গম্ভীর মুখো এক আরব এসে আরবি শেখায়, যে ভালো ইংরেজিও বলতে পারে। নুসরাত ওদের হাম্মাম খানায় নিয়ে গোসল করায়। দুপুরে তেহারি আর রাতে কাবাব রুটি খেতে দেয়। স্বাধীনতা বলতে বড় বিবির খাসমহল বাদে জোহরা খাতুনের বাকি মহল–এটুকু জায়গায় ওরা চলাফেরা করতে পারে।
এক মহল থেকে আরেক মহলের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, যেখানে দাঁড়িয়ে নিচে ঘাসজমি আর ওপরে খানিকটা আকাশ দেখা যায়। মহলগুলোর সঙ্গে করিডোর দিয়ে যোগাযোগ আছে বটে,

সেখানে পাহারা দেয় ভয়াল দর্শন কাফ্রিরা। ওদের চেহারা দেখলেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। শেখ আর বিবিরা ছাড়া আর কেউ ওই করিডোরে হাঁটতে পারে না।

গোটা প্রাসাদ একটা গোলাক ধাঁধার মতো মনে হয়েছে বিনির। ওরা প্রাসাদের কোন অংশে আছে, কোন দিক সামনে, কোন দিক পেছনে বোঝার কোনো উপায় নেই। যেদিকে তাকায় সেদিকেই শুধু পাথরের দেয়াল আর খিলান।

তৃতীয় দিন ঘটলো ওদের পরম প্রত্যাশিত ঘটনা। দুপুরে খাওয়ার পর বিবি আর বাদী নফররা সবাই ঘুমোয়। সেদিন ফাতিমারাও ঘুমোচ্ছিলো। বিনি কিছুক্ষণ শুয়েছিলো। বনির কথা ভাবতে গিয়ে ওর আর ঘুম এলো না। বিছানা থেকে উঠে একা হাঁটতে হাঁটতে মেজ বিবির মহলের কাছে এলো। বিচিত্র রঙের ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝে, ছাদ থেকে ঝোলানো বিশাল সব বেলজিয়ান ঝাড় বাতি দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়লো মেজ বিবির মহলের মোটা থামের আড়াল থেকে ওরই বয়সী একটা মেয়ে লুকিয়ে ওকে দেখছে। মেয়েটার চোখ হালকা নীল, চুল সোনালি, দেখেই মনে হয় শেখদের কারো মেয়ে।

বিনি একটু এগিয়ে ইশারায় ওকে ডাকলো। আরব মেয়েটাও অবাক হয়ে বেরিয়ে এলো থামের আড়াল থেকে। বিনি ওকে ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি ইংরেজি বলতে পারো?

হ্যাঁ পারি। আমি আমেরিকান স্কুলে সিক্সথ গ্রেড-এ পড়ি।

বিনি হেসে নিজের নাম বলে মেয়েটার নাম জিজ্ঞেস করলো। মেয়েটা হেসে বললো, আমার নাম নাসরীন। তুমি এখানে কী করছো?

আমি বাংলাদেশের মেয়ে।

সেটা কোথায়?

ইন্ডিয়ার পাশে। তুমি ইন্ডিয়ার নাম শুনেছো?

শুনবো না কেন? আমি হিন্দি ছবি খুব পছন্দ করি। শাহরুখ খান আর মাধুরীকে আমার খুব ভালো লাগে।

আমিও হিন্দি ছবি খুব পছন্দ করি। শাহরুখ খান আর মাধুরী আমারও প্রিয়। তুমি কোন দেশের?

কোন দেশের কী বলছো? খিল খিল করে হেসে নাসরীন বললো, আমি শেখ আবদুল খালেকের মেয়ে। এটা আমার আম্মা খাদিজা খাতুনের মহল। তোমার বাবা মা নেই?

আমর সব আছে। বড় বিবিজির লোকরা আমাকে এখানে জোর করে ধরে এনেছে।

এখানে তো জোর করে কাউকে আনার নিয়ম নেই। নাসরীন গম্ভীর হয়ে বললো, তুমি সত্যি কথা বলছে তোতা?

আল্লার কসম বলছি নাসরীন। আমি যা বলছি এর এক বিন্দুও মিথ্যা নয়। এই বলে ওদের কীভাবে এখানে আনা হয়েছে নাসরীনকে সব বললো।

ওর কথা শুনে নাসরীন খুবই অবাক হলো–বড় বিবি সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা শুনেছি। নফর বাদীদের ও মারধোর করে। ও যে এত খারাপ আমার জানা ছিলো না। দাঁড়াও আমার আম্মাকে বলি। তিনি আব্বাকে বলে তোমাকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

বিনি আঁতকে উঠলো–প্লীজ তোমার আম্মা আব্বাকে বোলো না। তোমাকে আমি বিশ্বাস করে এ কথা বলেছি। তুমি আমার বিশ্বাস ভেঙে দিও না।

তুমি নিশ্চয় এখানে চিরকাল থাকতে চাও না?

না চাই না। তবে এখান থেকে বেরোবার আগে আমার ভাই কোথায় আছে জানতে চাই। আমার সঙ্গে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ থেকে যেসব ছেলেমেয়েরা এসেছে। ওরা কোথায় আছে জানতে চাই।

নাসরীন একটু ভেবে বললো, আমার তিন নম্বর আম্মা আয়শা খাতুনেরও দাস বাজার থেকে ছেলে মেয়ে কেনার অভ্যাস আছে। আর আছে আমার চাচা শেখ জালাল। চাচার অনেক উট আছে রেস খেলার জন্য। চাচা রেস-এর জন্য বাচ্চা কেনে।

তোমার চাচা কোথায় থাকেন?

এখান থেকে বেশি দূর না। আমার এক চাচাতো ভাই ফয়সল আমার সঙ্গে পড়ে। ওকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে ওদের বাড়িতে তোমার ভাইকে আটকে রেখেছে কিনা।

তুমি অনেক দয়ালু নাসরীন। আমার আব্বু আম্মু নিশ্চয়ই তোমার জন্য দোয়া করবেন।

নাসরীন হেসে বললো, দোয়ার জন্য আমি তোমাকে সাহায্য করছি না। ওসব আমি বিশ্বাসও করি না। তোমার চেহারা দেখে মনে হয় আমি একটা ছোট মাধুরী দেখছি।

বিনি হেসে বললো, তোমাকে দেখে মনে হয় আকাশ থেকে বুঝি একটা পরি নেমে এসেছে।

নাসরীন কি বলতে যাবে হঠাৎ কিসের শব্দ শুনে ও চমকে উঠলো–শিগগির পালাও! কেউ আসছে এদিকে। কাল ঠিক এ সময়ে–বলে সাদা প্রজাপতির মতো উড়ে হারিয়ে গেলো ও।

বিনি দৌড়ে থামের আড়ালে সরে এলো। দেখলো নাসরীনদের মহলের এক বাদী বড় ট্রেতে করে ঢেকে কী যেন নিয়ে গেলো করিডোরের দিকে।

সন্ধ্যায় মাশকাতের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রঘুবীর সিং তাঁর বাড়িতে এক পার্টি দিয়েছিলেন। আমন্ত্রিত ছিলেন শুধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জাহেদ চৌধুরী আর পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হাসান গুল। পার্টিটা আসলে লোক দেখানো দিল্লী, ঢাকা আর ইসলামাবাদ থেকে কতগুলো সংবাদ পেয়ে তারা খুব চিন্তিত ছিলেন। তিন দেশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে তিনজন যুবকও এসেছে এই কাজে। বাংলাদেশের ইকবাল আগেই বলেছে কী ভাবে ওরা জানতে পেরেছে পাচার করা ছেলেমেয়েরা যে মাশকাত এসেছে। পাকিস্তানের এজাজ বললো, আজ সারাদিন আনি পোর্টে খোঁজ খবর নিয়েছি। তিন দিন আগে আল জেদ্দাহ শিপিং লাইন্স-এর যে জাহাজটা চিটাগাং থেকে বোম্বে, করাচী হয়ে এসেছে ওটা আজ ভোরে এডেন চলে গেছে।

ভারতের দীপক বললো, আমি এখানকার নিউজ এজেন্সিগুলোর সঙ্গে কথা বলেছি। রয়টারের বুরো চীফ উটের রেস সম্পর্কে অনেক খবর জানে। বললো, মাশকাতের সবচেয়ে বড় রেস খেলনেওয়ালা হচ্ছে শেখ জালাল বিন মোত্তালিব। শহরের বাইরে মরুভূমির ভেতর ওর রেস খেলার মাঠ আছে। মাসে একবার হয় রেস। অন্য সব আরব দেশ থেকেও শেখরা আসে।

ভারতের রাষ্ট্রদূত রঘুবীর সিং বললেন, রয়টারের প্রতিনিধি আমাকে আগেও বলেছিলো। এদের পুলিসকে আমি জানিয়েছিলাম ব্যাপারটা। পুলিস চীফ আমাকে বললো ওরা খবর নিয়ে জেনেছে পশ্চিমা সাংবাদিকদের এসব বানানো রিপোর্ট। আজকাল উটের দৌড়ে মানুষের বাচ্চা ব্যবহার করা হয় না।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হাসান গুল নতুন এসেছেন। বললেন, আমি উটের রেসের কথা শুনেছি। কিন্তু বাচ্চা কীভাবে ব্যবহার করে এটা আমার বোধগম্য হয়নি।

ম্লান হেসে রঘুবীর সিং বললেন, ঈশ্বর না করুক—আমাকে যেন এমন দৃশ্য দেখতে না হয়। আমি পড়েছি বাচ্চাদের, ওরা উটের পেছনে বাঁধে। উট দৌড়োবার সময় বাচ্চারা উটের পেছনে বাড়ি খেয়ে কাঁদে। বাচ্চাদের কান্নায় উট ভয় পেয়ে জোরে দৌড়োয়। রেস শেষ হওয়ার আগেই হতভাগ্য বাচ্চাগুলো মারা যায়।

হাসান গুল শিউরে উঠে বললেন, মানুষ এত বর্বর হতে পারে?

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জাহেদ চৌধুরী তিক্ত হেসে বললেন, এরা র তো বুঝলাম। কিন্তু যারা আমাদের দেশ থেকে বাচ্চাদের চুরি করে নিয়ে শেখদের কাছে বিক্রি করছে তাদের আপনারা কী বলবেন? আমরা খবর পেয়েছি একাত্তরের যুদ্ধের সময় যারা পাকিস্তানের আমির দালালী করে হাজার হাজার মানুষ মেরেছে তাদের দলই এসব কাজ করছে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বিব্রত গলায় বললেন, ওদের পাকিস্তানের সাধারণ মানুষরা ঘৃণা করে। আমাদের এবারের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ওরা একটা সিটও পায়নি।

পাকিস্তানে ওরা হেরে গিয়ে বাংলাদেশকে ওদের ঘাঁটি বানাতে চাইছে।

বাংলাদেশের গোয়েন্দা ইকবাল আহমেদ বললো, স্যার আমরা রাজনৈতিক আলোচনা পরে করে এখন আমাদের অপারেশন সম্পর্কে কিছু কথা বলতে পারি।

হ্যাঁ ইকবাল, বলো তুমি কী ভেবেছো।

স্যার, কাল এখানে এসে কয়েক জায়গায় ঘুরে এটা আমার মনে হয়েছে এখানকার পুলিস খুবই করাপ্ট। ইন্টারপোল থেকে প্রেশার দেয়া না হলে এদের টনক নড়বে না। আমি কয়েকজন পশ্চিমা সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা শুধু সোর্স খুঁজছে কী ভাবে উটের রেসের বাচ্চাদের কাছে পৌঁছোনো যায় । আমি জানতে পেরেছি তিন দিন পরই শেখ জালালের রেস। যেভাবে হোক বাচ্চাগুলোকে এর আগেই উদ্ধার করতে হবে।

পাকিস্তানের গোয়েন্দা এজাজ খান বললো, এদের স্লেভ মার্কেটে আমি এক পাকিস্তানী খুঁজে পেয়েছি। ওকে টাকা দিতেই অনেক খবর দিয়েছে আমাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে–সে আমাকে সাতজন শেখের নাম দিয়েছে যারা স্লেভ মার্কেটের নিয়মিত খরিদ্দার। এদের ভেতর সবচেয়ে বড় খরিদ্দার হচ্ছে শেখ আবদুল জালাল বিন মোত্তালিব।

ভারতের দীপক বললো, আমাদের পিটিআইর গীতা শেরগিলকে বলেছি, কোনো ভাবে শেখ জালালের একটা সাক্ষাৎকার নিতে পারে কিনা। বলবে ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকা ওকে এর জন্য অ্যাসাইন করেছে । গীতা সুন্দরী আর শেখ জালালও ভারতীয় সুন্দরী পছন্দ করে। প্রতি মাসে নিজের জেট প্লেনে বোম্বে যায় রাত কাটাতে।

প্রৌঢ় রঘুবীর সিং বললেন, গত দুদিনে আমাদের তরুণ গোয়েন্দাদের কাজ খুবই সন্তোষজনক–এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

ইকবাল গম্ভীর হয়ে বললো, এক্সিলেন্সি, যতক্ষণ বাচ্চাদের উদ্ধার করতে না পারবো ততক্ষণ সন্তোষ প্রকাশের কোনও অবকাশ নেই।

রাত আটটার দিকে যখন লম্বামুখো ওদের খাবার খাইয়ে হাত টাত বেঁধে রেখে চলে গেছে তখন খুব সাবধানে দরজা খুলে বনিদের ঘরে ঢুকলো বারো তেরো বছরের এক আরব ছেলে। লম্বায় ওদের সবার চেয়ে বড়, টকটকে ফর্শা রঙ, চোখ দুটো গভীর নীল, চুল কোঁকড়া সোনালি, ঠোঁটে আঙুল চেপে ওদের চুপ থাকতে বললো। তারপর দরজাটা বন্ধ করে আসলামের কাছে বসে চাপা গলায় ইংরেজিতে জানতে চাইলো, তোমাদের এখানে বনি নামে কেউ আছে?

বনি অবাক হয়ে বললো, আমার নাম বনি। তুমি কে? আমার নাম জানলে কী ভাবে?

আমার নাম ফয়সল। মিষ্টি হেসে সুন্দর ছেলেটা বললো, আমার কাযিন নাসরীন আমাকে বিকেলে ফোন করে জানিয়েছে আমাদের বাসায় বনি নামের কোনো ছেলে আছে কি না। বনির বোন বিনি ওদের বাড়িতে আছে।

বনি উত্তেজিত হয়ে বললো, বিনি ভালো আছে?

হ্যাঁ ভালো আছে। ফয়সল বললো, নাসরীনের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ও বলেছে তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে তোমাদের দূতাবাসে পৌঁছে দিতে।

বনি বললো, তোমাকে ধন্যবাদ ফয়সল। আমি আসলাম, ইমরানদের এখানে রেখে কোথাও যাবো না।

ফয়সল বললো, সবাইকে এক সঙ্গে বের করা খুব মুশকিল হবে। তবু আমি চেষ্টা করবো। গত মাসেও আমি দুটো ছেলেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলাম।

আসলাম বললো, শুনেছি। সেজন্য দিন রাত আমাদের বেঁধে রাখা হয়।

বনি জানতে চাইলো আমরা–এখান থেকে বেরুবো কেমন করে?

ফয়সল একটু ভেবে বললো, দেখ, আমি শেখের ছেলে হলেও আঠারো বছর পর্যন্ত আমাদের প্রচণ্ড শাসনের ভেতর রাখা হয়। স্কুল আর বাড়ি ছাড়া একা কোথাও আমরা যেতে পারি না। স্কুলে আমেরিকান অ্যাম্বাসাডরের ছেলে ডেভিড আমার সঙ্গে পড়ে। আমার খুব ভালো বন্ধু। ওকে বলবো ওর বাবার সঙ্গে কথা বলতে। আমাদের আর্মির জেনারেলদের সঙ্গে ওর বাবার পরিচয় আছে। ডেভিড বলুক কিভাবে ওরা তোমাদের উদ্ধার করবে।

আর্মির দরকার কী? আমরা তো পুলিস স্টেশনে গিয়ে ওদের সাহায্য চাইতে পারি?

মাশকাতের পুলিসরা সব শেখদের চাকর। পুলিস চীফ রোজ এসে আব্বার সঙ্গে গল্প করে। আব্বার রেস খেলার সঙ্গীদের ভেতর সেও একজন।

তোমার আব্বা কি রোজ রেস খেলে?

না, মাসে একবার। রোজ খেলার জন্য এত বাচ্চা কোথায় পাবে?

যে সব বাচ্চাদের রেস খেলতে নেয় সবাইকে কী মেরে ফেলা হয়?

হ্যাঁ, সবাই মরে যায়।

তোমাদের দেশে আইন কানুন কি কিছুই নেই?

আইন তো আমার আব্বাদের মতো শেখরা তৈরি করে, তাদের রক্ষার জন্য। আর বাচ্চা আনে আফ্রিকা আর এশিয়ার গরিব দেশ থেকে, যাদের বাবা মা নেই, যারা খেতে পায় না।

আসলাম সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো–আমরা কেউ গরিব নই। আমাদের বাবা মা সব আছে।

শেখদের বলা হয় তোমাদের রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে। না খেয়ে এমনিই মরে যেতে। কদিন খাইয়ে দাইয়ে তাজা করে রেস খেলানো হয়। তোমাদের দেশে কেউ কি এর প্রতিবাদ করে না?

জানি না করে কি না। আমি বড় হলে সব বন্ধ করে দেবো।

তুমি খুব ভালো ছেলে। আসলাম একটু হেসে বললো, বড় হতে এখনো তোমার অনেক দেরি। এখনকার মতো আমাদের পালাতে সাহায্য করো।

ফয়সল উঠে দাঁড়ালো–আমি কাল আসবো

.

১০.

পরদিন সকালে ইশকুলের ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই নাসরীন আর ডেভিডকে নিয়ে ফয়সল ছোট খাট একটা মিটিঙ সেরে ফেললো। নাসরীনকে ও রাতেই জানিয়েছে বনি যে ওদের বাড়িতে আছে। ডেভিডের কথা শুনে নাসরীন বলেছে, ঠিক আছে ডেভিডকে একটু আগে আসতে বলো ইশকুলে। আমরা ক্লাস শুরুর আগেই কথা বলবো।

পুরো ঘটনাটা ডেভিডকে জানিয়ে ফয়সল এই বলে কথা শেষ করলো, আমাদের এবং অন্য শেখদের বাড়িতে আটকে রাখা বিদেশী ছেলেমেয়েদের অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে। আর এ কাজ দু দিনের মধ্যেই করতে হবে। পরশু উটের রেস।

হার্ডি সিক্স-এর মহা ভক্ত ডেভিড উত্তেজিত হয়ে বললো, বাবাকে এর মধ্যে আনার দরকার কী? আমরা তিনজন মিলে যদি একটা দল করি–ওদের উদ্ধার করা যাবে না?

নাসরীন ম্লান হেসে বললো, আমি যদি আরব শেখের মেয়ে না হয়ে তোমাদের দেশের কোনো সাধারণ মেয়েও হতাম তাহলে পারতাম। তুমি জানো না আমাদের কী রকমে কড়া শাসনের ভেতর রাখা হয়।

ফয়সল একই কথা বললো, ইশকুলের পর আমাকেও বাড়ি ফিরতে হয়। তোমার সঙ্গে কোথাও যাবো তার কোনো উপায় নেই।

এ নিয়ে ভেবো না। তোমরা নিজেদের বাড়িতে বসে কাজ করবে। আমরা তো টেলিফোন ব্যবহার করতে পারি। ছেলেমেয়েদের কোড ওয়ার্ড হবে কবুতর। আমরা কবুতর ওড়ানোর খেলা নিয়ে টেলিফোনে আলাপ করলে কেউ সন্দেহ করবে না।

তোমার বাবার সাহায্য দরকার ওদের দূতাবাসগুলোকে জানাবার জন্য। তাছাড়া আমাদের বাড়িতে ঢুকে ওদের উদ্ধার করতে হলে আর্মির সাহায্য লাগবে।

শোন দূতাবাসেরও কোড ওয়ার্ড ঠিক করতে পারি। তিনটা দেশের ছেলেমেয়েই তো বেশি! ঠিক আছে ইণ্ডিয়ার দূতাবাসের কোড হবে আপেল গাছ, পাকিস্তানী দূতাবাসের কোড হবে খেজুর গাছ আর বাংলাদেশ হবে জলপাই গাছ।

নাসরীনের মাথায় এত সব কোড ওয়ার্ডের প্যাঁচ ঢুকলো না। শুকনো গলায় বললো, যাই করো না কেন ডেভিড, কোনো অবস্থায় এটা জানাজানি হওয়া ঠিক হবে না যে, আমরা ওদের পালাতে সাহায্য করেছি। তোমার কথা আলাদা। ফয়সল আর আমার ব্যাপারে বাড়ির কেউ জানতে পারলে কেটে দু টুকরো করে ফেলবে।

কাষ্ঠ হেসে ডেভিড বললো, ঠিক আছে নাসরীন! দলের লিডার হিসেবে আমি লক্ষ্য রাখবো তোমাদের কথা যেন কেউ জানতে না পারে। তোমাদের যা করার সেটা সবার চোখের আড়ালেই করবে।

ওদের ইশকুল ছুটি হয় বারোটায়। ঘরে ফিরে দুপুরের খাওয়া শেষ করে নাসরীন বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো কতক্ষণে সবাই ঘুমোয়।

আড়াইটা নাগাদ নাসরীনের মনে হলো ওদের মহলটা একেবারে সুনসান হয়ে গেছে। পা টিপে টিপে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

নি অধীর আগ্রহে থামের আড়ালে লুকিয়ে নাসরীনের জন্য অপেক্ষা করছিলো। ফাতিমাদের ও জানিয়েছে নাসরীনের সঙ্গে ওর পরিচয়ের কথা। ফাতিমারাও সেদিন দুপুরে ঘুমোয়নি। ওরাও অপেক্ষা করছিলো নাসরীনের সঙ্গে কথা বলে বিনি কখন ফেরে তার জন্য।

নাসরীনকে বারান্দায় দেখে বিনি আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। নাসরীন বললো, অনেকগুলো ভালো খবর আছে বিনি। প্রথম খবর হচ্ছে বনির সন্ধান পাওয়া গেছে। ওরা আছে ফয়সলদের বাড়িতে। দ্বিতীয় খবর হচ্ছে ফয়সল দায়িত্ব নিয়েছে বনিদের পালাবার সুযোগ করে দেয়ার। ওখানে অনেক বাচ্চা আছে। বনিদের সঙ্গে ও এ নিয়ে কথাও বলেছে। শেষ সুখবর হচ্ছে আজ রাতে আমি তোমাদের পালাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

নাসরীনের কথা শুনে উত্তেজনায় বিনির বুকের ভেতর ধুপধুপ শব্দ হচ্ছিলো। তবে রাতে পালাবার আইডিয়াটা ওর ঠিক পছন্দ হলো না। বললো, তোমার সহযোগিতার জন্য অনেক ধন্যবাদ নাসরীন। কিন্তু রাতে কিভাবে পালাবো?

আমাদের ইশকুলের সিস্টার ইসাবেলার সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি রাত দশটায় গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়ির পেছনের রাস্তায় অপেক্ষা করবেন। ওদিকে পাহারা কম থাকে। তিনি তোমাদের দূতাবাসে পৌঁছে দেবেন। তোমরা তৈরি থেকো। রাতে আমি আবার আসবো।

তুমি এ মহলে আসবে কী ভাবে?

প্রত্যেক মহলে কাজের লোকদের জন্যে পেছনে সিঁড়ি থাকে। আমি ঠিক দশটায় আসবো। রাত নয়টার পর আমাদের আম্মারা কেউ মহল থেকে বেরোয় না। এই বলে নাসরীন দ্রুত পায়ে সরে গেলো বারান্দা থেকে।

বিনি ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে নাসরীনের সঙ্গে ওর যে কথা হয়েছে ফাতিমাদের সব খুলে বললো। ফাতিমা উত্তেজিত হয়ে বিনিকে জড়িয়ে ধরে বললো, বিনি তোমার জন্যই আমরা মুক্ত পৃথিবীর আলো বাতাস দেখতে পাবো।

আফজাল করুণ মুখে জানতে চাইলো, বিনি বাজী, ফয়সলদের বাড়িতে আমার বোন সীমা আছে?

নিশ্চয় আছে। ফয়সল বলেছে অনেক বাচ্চা আছে ওদের বাড়িতে।

সবাই পালাতে পারবে?

আমরা যদি এখান থেকে পালাতে পারি তাহলে অন্যরাও পারবে। না পারলে আমাদের সরকার আছে, দূতাবাস আছে। মনে সাহস আনো আফজাল।

রাতে খাবার দিতে এসে নুসরাত বাঁদী বললো, বেটিরা, তোমাদের জন্য সুখবর আছে। কাল থেকে তোমরা আলাদা ঘরে থাকবে, বড় বিবিজির খাস মহলে। এই ছোঁড়াটার ওপর বিবিজির নজর পড়েছে। বলে ফয়সলের গাল টিপে লাল করে দিয়ে ও চলে গেলো।

দিবা বললো, তার মানে আমরা যদি আজ রাতে পালাতে না পারি আর কোনো দিনই পারবো না।

ওরা সবাই জানে বড় বিবির খাস মহলে এত কড়া পাহারা যে, পিঁপড়ে পর্যন্ত পাহাড়াদারের নজর এড়িয়ে ঢুকতে পারবে না। নাকি শত শত কোটি টাকার হীরা জহরত আছে বড় বিবি জোহরা খাতুনের খাস মহলে। নিজের ছেলেমেয়ে নেই বলে দামী গহনা কেনা ওর বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কথা ওরা শুনেছে নুসরাতের কাছ থেকে।

রাত ঠিক দশটায় নাসরীন এলো ওদেব কামরায়। ওর আব্বা আজ বড় বিবির মহলে থাকবেন। চাকর, বাদী পাহারাদার সব ওদিকে ব্যস্ত। বাদীরা যে রকম আলখাল্লার মতো পোশাক পরে নাসরীন ওরকম পোশাক পরে এসেছে। পোটলায় বেঁধে ওদের চার জনের জন্য একই রকম পোশাক এনেছে। সেগুলো বের করে বললো, তোমাদের পোষাকের ওপর ঝটপট পরে নাও। রাস্তায় বেরিয়ে খুলে ফেলো। মহলের বাদীদের রাস্তায় দেখলে লোকজনের সন্দেহ হতে পারে।

ফাতিমা পোশাক পরতে পরতে বললো, সন্দেহ হবে কেন? এটাই তো আমার কাছে নিরাপদ মনে হচ্ছে।

মহলের বাদীদের রাস্তায় বেরোনো বারণ। সংক্ষেপে জবাব দিলো নাসরীন।

বাঁদীদের পোষাক পরে দ্রুত পায়ে ওরা চারজন নাসরীনের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পেছনের সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে একজন হাবসি পাহারাদারের পাল্লায় পড়েছিলো। পাহারাদার নিয়ম মতো জিজ্ঞেস করেছে–কে যায়?

ওর গম গমে গলা শুনে বিনিদের সবার হাত পা কাঁপা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। নাসরীন সংক্ষেপে বললো, রসুলান বাদী।

ঠিক আছে যাও।

ফাতিমা লক্ষ্য করেছে পাহারাদারের আরবি বলার ঢং অন্যরকম। নাসরীনও ঠিক একই ঢংয়ে জবাব দিয়েছে।

পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে দুপাশে পাথরের দেয়ালের মাঝখান দিয়ে সরু একটা পথ দৌড়ে পেরিয়ে ওরা খিড়কি দরজায় এলো। চাপা উত্তেজিত গলায় নাসরীন বললো, ঝটপট পোশাক খুলে ফেলো।

বিনি পোশাক খুলেই নাসরীনকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমাদের জানা নেই। আমরা চিরকাল তোমার কথা মনে রাখবো।

নাসরীন বললো, আমি তোমাকে চিঠি লিখবো বিনি। এবার জলদী বেরোও।

দরজা খুলে ওদের একরকম ঠেলে বের করে নাসরীন দরজা লাগিয়ে দিলো। জনশূন্য রাস্তা! সিস্টার ইসাবেলা কিংবা তার গাড়ির কোনো পাত্তা নেই। দিবা ভয় পেয়ে ফিশ ফিশ করে বললো, নাসরীন কি মিথ্যে কথা বলেছে? কোথায় সিস্টার?

এখানে পঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। দৌড়াও। বলে সবার আগে দৌড় দিলো বিনি।

ওরা কোথায় যাচ্ছে কিছু না জেনেই বিনির পেছন পেছন দৌড়োচ্ছিলো। ভরসা এইটুকু, গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠলে লোকজনের দেখা পাওয়া যাবে। মাশকাতের সব লোক নিশ্চয় শেখদের মতো পাজী নয়।

গলির একটা মোড় পেরোতেই একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেতে গিয়ে নিজেকে কোনো বকমে সামলে নিলো বিনি। তাকিয়ে দেখলো চশমা পরা গির্জার একজন নান। চেহারা দেখে মনে হয় লেবানিজ অথবা মিশরীয় হবেন। বিনি হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত জিজ্ঞেস করলো, আনা ফি মাশকিলাত। উন সুর নী আনা তালাবতু রাজুলান মাহেরুন ফিল আংকেলিজিয়া।

সরি মাই চাইল্ড। অসহায় গলায় সিস্টার বললেন, আমি আরবী বলতে পারি না।

আপনি ইংরেজি বলতে পারেন? বিনি যেন হাতে চাঁদ পেলো।

ইজি মাই চাইল্ড। বলে ওর পিঠে হাত রেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন–তোমরা কি বিপদে পড়েছো?

আমরা সিস্টার ইসরাবেলাকে খুঁজছি। আপনি কি বলতে পারবেন কোথায় গেলে তাঁকে পাবো।

ওহ গড। আমি সিস্টার ইসাবেলা। তোমরাই কি শেখের বাড়িতে বন্দী ছিলে?

হ্যাঁ সিস্টার। আমার নাম বিনি। এরা ফাতেমা, দিবা আর আফজাল! বিনি ভেবেছিলো সিস্টার ইসাবেলা যখন আমেরিকান স্কুলে পড়ান তখন তিনিও নিশ্চয় আমেরিকান হবেন।

জলদি, এসো আমার সঙ্গে। কথা না বাড়িয়ে সিস্টার ইসাবেলা বিনি আর আফজালকে দুহাতে ধরে একরকম দৌড়ে গেলেন বড় রাস্তার দিকে।

সিস্টারের গাড়ি বড় রাস্তার ওপর রাখা ছিলো। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে সিস্টার বললেন, গলির ভেতর গাড়ি ঢোকাতে দিলো না পুলিস। জানোই তো শেখদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কত শক্তিশালী। ভাগ্যিস তোমাদের সঙ্গে দেখা হলো! নইলে আমাকে খুঁজতে গিয়ে কোন বিপদে পড়তে কে জানে!

বিনি বললো, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সিস্টার। আমাদের জন্য আপনি এত কষ্ট করলেন!

ধন্যবাদ দিতে হলে ডেভিডকে দিও। ও না বললে আমি কি জানতাম তোমরা এমন বিপদে পড়েছো!

ফাতিমা বললো, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি সিস্টার?

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের বাসায়। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আজ সন্ধ্যায়। ওখানে পাকিস্তান আর ভারতের রাষ্ট্রদূতরাও থাকবেন।

বিনি জানতে চাইলো, শেখ জালালের বাড়িতে যারা বন্দী আছে তাদের কীভাবে উদ্ধার করা হবে?

আমার ধারণা এতক্ষণে তাদেরও উদ্ধার করা হয়েছে। তোমাদের দেশ থেকে দারুণ বুদ্ধিমান এক গোয়েন্দা এসেছে। তারই বুদ্ধিতে এসব হয়েছে।

মাশকাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের বাড়ির পেছনের বিরাট লনে তখন দারুণ হৈচৈ কাণ্ড! ইউরোপ আমেরিকার টেলিভিশন নেটওয়ার্কের লোকজন, সাংবাদিক, ফ্লাড লাইট আর ঘন ঘন ফ্লাশের আলোতে হুলস্থুল অবস্থা। শেখ জালাল আর তার দুই বন্ধুর বাড়ি থেকে এশিয়ার কয়েকটি দেশের আড়াইশ ছেলেমেয়ে উদ্ধার হয়েছে।

ছেলেমেয়েরা কোথায় আছে জানার পর ইন্টারপোলের অফিসারদের সঙ্গে বসে প্ল্যান করেছে ইকবাল, এজাজ আর দীপক। শেখ জালাল প্রচণ্ড ক্ষমতাবান লোক। তার গায়ে আঁচড় কাটার ক্ষমতা বাদশারও নেই। তিন গোয়েন্দা পরামর্শ করে বুদ্ধি বের করেছে কীভাবে শেখকে কিছু না বলে কাজ উদ্ধার করা যায়।

সন্ধ্যায় ইন্টারপোলের অফিসার শেখ জালালের সঙ্গে দেখা করে বলেছে, অনারেবল শেখ বোধহয় জানেন না, তার অগোচরে তারই কিছু বাংলাদেশী আর পাকিস্তানী কর্মচারী কী ভয়ানক এক ব্যবসা ফেঁদেছে!

তাই নাকি! অবাক হয়ে শেখ জানতে চেয়েছেন–কিসের ব্যবসা!

মানুষের বাচ্চা কেনা বেচার। এই কর্মচারীরা এমনই শয়তান এ কাজে শেখ জালালের সুনাম পর্যন্ত ওরা জড়িয়েছে। প্রাসাদের বিভিন্ন অংশে কিছু রক্ষীকে হাত করে ওরা বাচ্চাদের লুকিয়ে রেখেছে। শেখ জালাল যদি অনুমতি দেন এসব বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীদের গ্রেফতার করে বাচ্চাগুলো উদ্ধার করি!

শেখ জালাল নিজের সুনাম বাঁচাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই অফিসার। বদমাশগুলোকে গ্রেফতার করে আমার হাতে তুলে দিন। ওদের আমি কঠিন সাজা দেবো। শিগগির বাচ্চাগুলোকে উদ্ধার করে আমার সম্মান রক্ষা করুন।

ওরা শুধু আপনার সম্মান নয়, শেখ আজিজ আর শেখ বশীরের সম্মানও এর সঙ্গে জড়িয়েছে।
ইন্টারপোলের অফিসার কী ইঙ্গিত করছে বুঝতে অসুবিধে হয়নি শেখ জালালের। বললেন, আমি এক্ষুণি শেখ বশীর আর শেখ আজিজকে জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য।
ফয়সল আগেই টেলিফোনে ডেভিডকে জানিয়ে রেখেছিলো কোন কবুতর কোন খোপে আছে। ওদের খুঁজে বের করতে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি।
সিস্টার ইসাবেলার গাড়ি থেকে বিনিকে নামতে দেখে বনি ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, আপু, একটু আগে আব্ব, আম্মু আর বড় চাচীর সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা আমাদের নিতে আসবে।
ফয়সলকে দেখে ছুটে এলো সীমা। ভাইয়া তুমি কোথায় ছিলে, বলে ওর সে কী কান্না। সিস্টার ইসাবেলা পকেট থেকে টফি বের করে ওর মুখে গুঁজে দিয়ে সেই কান্না থামালেন ।
একটু পরেই আমেরিকান পতাকা উড়িয়ে মস্ত লম্বা এক ইমপালা এসে থামলো পোর্টিকোর নিচে। বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতরা এগিয়ে গেলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত টমাস মর্গান গাড়ি থেকে নেমে তিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, খবর না দিয়ে পার্টিতে যোগ দিচ্ছি বলে আশা করি কিছু মনে করবেন না। আমার ক্ষুদে শয়তানটার অত্যাচারে আসতে হলো।
গাড়ি থেকে ডেভিড আর ডেভিডের মা-ও নামলেন। মিসেস মর্গান বললেন, ক্ষুদে শয়তান কী করেছে সেটা না বললে ওঁরা বুঝবেন কেন?
ডেভিড বললো, মা, এটা টপ সিক্রেট, তোমাকে বলিনি!
মিসেস মর্গান আঁতকে ওঠার ভান করে বললেন, দুঃখিত, আমার একদম মনে ছিলো না।
বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মিসেস চৌধুরী এগিয়ে এসে মিসেস মর্গানকে লনের দিকে নিয়ে গেলেন। টমাস মর্গান তিন রাষ্ট্রদূতকে বললেন, আসুন, আমরা এই ফাঁকে আলোচনা করে ঠিক করি এসব বর্বরতা চিরদিনের জন্য বন্ধ করার ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি। সাংবাদিকরা সবাই এখানে আছে। ওরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবে।
ডেভিড চারপাশে তাকিয়ে বনিকে বললো, কই এত কথা শুনলাম তোমার বোনের, বিনি কোথায়?
এই যে আমি। বিনি এগিয়ে এসে ডেভিডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললো, নাসরীনের কাছে আমি শুনেছি–তুমি আমাদের জন্য যা করেছে।

বিনি কথা শেষ করতে পারলো না। ডেভিড নিচু গলায়–যেন ষড়যন্ত্র করছে, এমনভাবে বললো, বিনি, আমরা কেউ কিছু করিনিঃ নাসরীন, ফয়সল, আমি কেউ না! অফিসিয়ালি ধন্যবাদ দাও সিস্টার ইসাবেলা আর তিন গোয়েন্দাকে।

বিনি মৃদু হেসে বললো, সিস্টার, আমি আপনার কেয়ারে আমাদের তিন নেপথ্য বন্ধুকে চিঠি লিখবো।

দিবা আর ফাতিমা এগিয়ে এসে বললো, তুমি একা কেন লিখবে? এত স্বার্থপর কেন তুমি? আমরা সবাই ডেভিডদের চিঠি লিখবো।

ডেভিড আঁতকে ওঠার ভান করলো তার মানে আড়াইশ চিঠি! সিস্টার, আমি পাগল হয়ে যাবো!

ডেভিডের কথা শুনে সবার সঙ্গে সিস্টার ইসাবেলাও গলা খুলে হাসলেন।